জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালা

গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের যত্ন

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ, ডিপ. লিব.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের "পুস্তক নির্ব্বাচন" ও "পুস্তকের তালিকা প্রণয়নের" ব্যবহারিক ক্ষেত্রের শিক্ষক

*

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক
বি. এস. কেশবনের
ভূমিকা সম্বলিত

জিজ্ঞাসা

তিন

সম্পাদকের কথা

মানুষের মনে আজ অনন্ত জিজ্ঞাসা। কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজজীবনে নানাবিধ সমস্যার জালে সে আচ্ছন্ন। এই সমস্যার যে চিন্তাগত দিক তারই আলোচনা এই জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য। কোন নির্দিষ্ট সময়ে না হলেও নিয়মিতভাবেই কালোপযোগী পুস্তিকা এই পর্যায়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালার প্রথম বই 'গণতন্ত্র ও নির্বাচন (দাম আট আনা) প্রকাশিত হয়েছিল। এতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও আদর্শের নিরপেক্ষ বর্ণনা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র ঘোষের রচনা, ইতিহাস থেকে নির্বাচিত কয়েকটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সমষ্টি 'ইতিহাসের অভিযান' (দাম আট আনা) ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হলেও তৃতীয় সংখ্যা জিজ্ঞাসা সাধারণ পাঠক, বিশেষতঃ যাঁরা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী, তাঁদের কাছে অপরিহার্য হবে বলে আমরা মনে করি। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের ভূমিকা শুধু এই সংখ্যাটিকে নয়, সমগ্র জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালাকে সম্মানিত করেছে।

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

গ্রন্থাগার পরিচালনা

ও

পুস্তকের যত্ন

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ, ডিপ.লিব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের "পুস্তক
নির্ব্বাচন" ও "পুস্তকের তালিকা প্রণয়নের"
ব্যবহারিক ক্ষেত্রের শিক্ষক

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালা

তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

মুদ্রক

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৫এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম দেড় টাকা

INTRODUCTION

Sri Rajkumar Mukherjee has asked me to introduce his primer on Library Administration, written in simple Bengali, illustrated with charts and drawings, and aimed at people who have not the time or opportunity to afford formal training in Librarianship. That is not to say that it is of no use to those who are actually taking the certificate course sponsored by the Bengal Library Association. It will be highly useful to them also. Primarily it is expected to inform the countless Library authorities, private and public, as to what should be done with their Libraries, especially if it happens to be a small Library, on scientific lines. The schools will greatly benefit by following some of the very simple instructions given in this primer. In this country there is a great dearth for books written in simple style on such topics, and I welcome this little book with some enthusiasm.

A word as to the author : He has spent a long time working in one of the most important Libraries in Bengal, the Calcutta University Library, as its Chief Cataloguer. He also has experience of teaching University students in Librarianship. With this perspective he comes to the writing of this primer and I feel he has succeeded in his modest aim.

National Library
Belvedere
Calcutta-27, 8th March, 1954.

B. S. Kesavan
Librarian.

ভূমিকা

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ক্রমশঃ গড়ে উঠছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনও কিছু কিছু সুরু হ'য়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণ গ্রন্থাগার মনা হ'য়ে উঠবে। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধীয় একখানিও বই নেই। এই অভাব পূর্ণ করবে এই আশায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখা হ'লো। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দেশের লোক যে ক্রমশঃ সচেতন হ'য়েছে তা বুঝতে পারা যায় এই বইখানি প্রকাশে প্রকাশকের আগ্রহ দেখে। কিছু দিন আগেও এ ধরণের বই প্রকাশ করতে প্রকাশকরা রাজী হ'ন নি। এদিক থেকে ক্যালকাটা বুক ক্লাব হ'লেন প্রথম উদ্যোগী।

চন্দননগর
১৯৫৪

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

মণ্টি

তুমি তো জানো বই আমাদের জীবন, বই না থাকলে যেন আমাদের কিছুই থাকে না। তুমি বই ভালোবাসো সব চেয়ে বেশী তাই তোমাকে এ-বইখানি দিলাম।

ছানি

গোড়ার কথা

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু জানবার পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন গ্রন্থাগার বলতে কি বোঝায় এবং গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যই বা কি।

কিছুদিন পূর্ব্বেও গ্রন্থাগার বলতে বোঝাতো "গ্রন্থের আগার" অর্থাৎ যেখানে কিছু বই সংগ্রহ করা থাকে। কিন্তু আধুনিক গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। এখন গ্রন্থাগারে বই ভরে রাখলেই কাজ শেষ হয় না প্রত্যেক বইখানি কাজের হওয়া চাই। প্রত্যেক বইখানি কাজের হ'লে তবেই গ্রন্থাগার কাজের হ'য়ে উঠবে এবং তবেই গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের কোন মূল্য থাকবে। গ্রন্থাগারকে কাজের করে তুলতে হ'লে কি প্রয়োজন সেই কথাই আমরা এখানে বলবো।

তিনটী বস্তুর সমন্বয়ে গ্রন্থাগার! লেখক, বই ও পাঠক। গ্রন্থাগার থেকে এই তিনটীর একটীকে বাদ দিলে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব থাকে না। তা হ'লে গ্রন্থাগারের কাজ ঠিক কি তা জানতে হ'লে আমাদের জানতে হয় লেখক কে, বই কি এবং পাঠক কাকে বলা হয়।

লেখক কে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে জানতে হয় লেখক কেন লেখে। অনেকে বলেন জনসাধারণের চিত্ত জয় করবার জন্যে, কেউ বলেন এই বাস্তবতার সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কিন্তু এই দুই উদ্দেশ্যই তিনি অন্য বহু উপায়ে সাধন করতে পারেন। তবে তিনি লেখেন কেন? আসলে লেখকের লেখার মূলে কারণ হ'চ্ছে অন্য। লেখক তার সমাজ তার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠেন সমাজের দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ, এসব সম্বন্ধে তিনি সচেতন হ'য়ে ওঠেন তখন তাঁর বাকি থাকে সমাজ পরিস্থিতি ভেঙ্গে গড়া আর না নয় সমাজ পরিস্থিতিকে আরও উন্নত করে তোলা কিন্তু দুই উদ্দেশ্যেরই লক্ষ্য হ'চ্ছে সৃষ্টি করা। তিনি তার আত্মচেতনার দ্বারা উপলব্ধ যা কিছু তার বইয়ের

মধ্যে লেখেন—এবং তার ধারণা থাকে বইখানি হ'বে তারই সৃষ্টি। কিন্তু যখন তিনি বইখানি শেষ করেন তখন দেখেন নিজের বইয়ের মধ্যে নিজেই ধরা পড়ে গেছে। অর্থাৎ নষ্ট বস্তু থেকে স্রষ্টাকে, বা স্রষ্টা থেকে সৃষ্ট বস্তুকে আর আলাদা করে দেখা যায় না। "দেবদাসের" মধ্যে শরৎচন্দ্র যেমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তেমনি শরৎচন্দ্রের মধ্যেও দেবদাস নিবীড় ভাবে জড়িত। ফলে লেখকের পক্ষে তার সৃষ্ট বস্তুকে আর বস্তু করে দেখা সম্ভব হয় না সুতরাং নিজেকে তিনি আর সৃষ্টিকর্ত্তা বলে গণ্য করতে পারেন না। কিন্তু বইখানির মূলে যে তিনি, তা তিনি দেখতে চান। তা হ'লে লেখকের বই লেখার সার্থকতা কোথা?

পাঠক যদি বই পড়তে চায় তবেই তাকে বই পড়ানো যায় কিন্তু বই পড়তে তাকে বাধ্য করা যায় না। বই পড়া না পড়া সম্পূর্ণভাবে পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। লেখক যতই লিখুন না কেন—তিনি পর্ব্বত প্রমাণ লিখলেও তাকে লেখক বলা চলে না কারণ লেখককে লেখক বলবে কে? সে তো পাঠক! সুতরাং লেখকের লেখার সত্যিকারের অস্তিত্ব সুরু হয় যখন তা পাঠকের চেতনার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। কিন্তু পাঠক লেখককে বাধ্য করতে পারেন না লিখতে বা লেখক পাঠককে বাধ্য করতে পারে না পড়তে। কেউ কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু লেখক যেই বই লিখতে সুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে তার আর একটুও স্বাধীনতা থাকে না, কারণ সমাজ পরিস্থিতি, রীতিনীতি, সমাজের দুঃখ দৈন্য, সমাজের মানুষের অবস্থা এ সবই তাকে এসে ঘিরে ধরে তখন তিনি হন এই সমাজ পরিস্থিতি রূপ সমুদ্রে একজন যাত্রী—আত্ম-সচেতন যাত্রী। তার সঙ্গে আরোও যাত্রী রয়েছে। সমাজের প্রত্যেক মানুষটী তার সাথী কিন্তু কেবল লেখক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু লেখক ও পাঠকের পিছনের ইতিহাস এক সেজন্যে যে মূহুর্ত্তে লেখক লিখতে কলম ধরেন সেই মুহূর্ত্তে তিনি ঠিক করে ফেলেন কাদের জন্যে তিনি বই লিখছেন।

লেখক পাঠককে পড়তে বাধ্য করতে পারেন না বটে : তিনি এই মাত্র বলতে পারেন "দয়া করে তুমি আমার বুইখানিকে পড়—আমি যা সৃষ্টি করেছি তা তুমি তোমার স্বাধীন চেতনার দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি কর। যে কাজ আমি সুরু করেছি এস সেই কাজ আমরা সকলে মিলে শেষ করি"—**সুতরাং লেখক পাঠকের অনুকম্পা প্রার্থী আর বইখানি হ'লো তার প্রার্থনা।** পাঠক বইখানি পড়তে সুরু করলো—বইখানি সৃষ্টি করবার সময় লেখক যে আনন্দ দোলায় দুলেছিলেন, পাঠকও সেই আনন্দ দোলায় দুলতে দুলতে বই-খানিকে সৃষ্টি করতে করতে ক্রমশঃ সৃষ্টির শেষে এসে হাজির হ'লো এবং বলে উঠল "এ সব কথা তো আমার জানা উচিৎ ছিল।" পাঠক যদি আত্মসচেতন হ'তো তা হ'লে সত্যই তার সব জানা থাকতো কারণ লেখক যা লিখেছেন তা যে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সে পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে লেখক এবং পাঠক উভয়েই গড়ে উঠছে। তখন পাঠকও লেখককে তার প্রার্থনা জানাতে থাক—"ওগো লেখক তুমি লেখ! তোমার চেতনালব্ধ আরো কিছু আমায় দাও"—তখনই লেখক পেল তার—"লেখক" উপাধি এ উপাধি সে পেয়েছে পাঠকের কাছ থেকেই—**"লেখক" কেবল মাত্র একটা "উপাধি"।**

এখন আমরা বুঝতে পারছি লেখক, পাঠক ও বই বলতে কি বোঝায়। লেখকের সঙ্গে পাঠকের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই অথচ পাঠক না হ'লে লেখক সৃষ্টি হয় না আবার লেখককে বাদ দিলে পাঠকের অস্বিত্ব থাকে না। পাঠক যখন একখানি বই পড়ে নিজেকে লেখকের পর্য্যায়ে এনে ফেললো—**তখন লেখক পাঠকের রূপে নিজেকে দেখলো স্রষ্টা হিসাবে।**

গ্রন্থাগার রয়েছে লেখক ও পাঠকের মাঝখানে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে লেখকের সঙ্গে পাঠককে সংযুক্ত করা। সুতরাং গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে লেখকের সৃষ্টিকে পাঠকের চেতনার ক্ষেত্রে নিয়ে এসে, সৃষ্টির অস্তিত্বকে সজীব করে তোলা। সুতরাং পুস্তকের যা'তে ব্যবহার হয় সেই দিকেই

গ্রন্থকারকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে এবং তা করতে গেলে গ্রন্থাগার প্রচারের আবশ্যক আছে এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না।

যে কোন বস্তুর প্রচারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে লাভ। ব্যবসাদার তা'র কোন বস্তুর জন্যে যথেষ্ট পয়সা খরচ করে প্রচার কার্য্য চালাতে পারে কারণ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ করা। লাভের আশা থাকে তাই তারা প্রচার কার্য্য চালায়। কিন্তু গ্রন্থাগার কি আশায় প্রচার করবে—আর কেনই বা সে প্রচার কার্য্য করবে? পাঠককে ভুলিয়ে আনা তো গ্রন্থাগারের কাজ নয় কারণ তা'তে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হয় না—লেখক তো পাঠককে ভুলিয়ে বই পড়াতে চায় না। তবে গ্রন্থাগার প্রচার কার্য্য চালাবে কেন?

কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে গ্রন্থাগার প্রচারের মূলেও লাভের আশা। কারণ গ্রন্থাগারে যে পয়সা খরচ করে বই কেনা হ'চ্ছে, সে পয়সার স্বার্থকতা পুস্তকের ব্যবহারে এবং পুস্তকের ব্যবহারই গ্রন্থাগারের লাভ। কেবল এই কারণেই গ্রন্থাগার প্রচারের প্রয়োজন। তবে গ্রন্থাগার প্রচারে প্রলোভন করার ভাব থাকা চলবে না। প্রলোভিত হ'চ্ছে এ ধারণা একবার পাঠকের মনে উদয় হ'লে আর সে গ্রন্থাগারে আসবে না। পাঠকের ঘাড়ে যে বই চাপিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে এ অনুভূতি যেন পাঠকের মনে জেগে না ওঠে।

কিন্তু গ্রন্থাগার যদি একথা বার বার প্রচার করতে থাকে: "আমি আছি, তোমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি কাজে লাগাতে পারি কারণ তোমাদেরই মত মানুষের চেতনা লব্ধ অভিজ্ঞতা আমার ভাণ্ডারে ভরা" তা হ'লে তো আর পাঠকের প্রলোভিত হবার ভয় থাকে না—এবং গ্রন্থাগারের দিক থেকেও এরূপ প্রচারের কাজ কিছু অন্যায় বলে মনে হয় না।

প্রচার কাজের প্রধান লক্ষ্য হ'চ্ছে তা হ'লে দুটী জিনিষ: প্রথম হ'চ্ছে সকলকে জানানো গ্রন্থাগার কি কাজ করতে পারে, তার কাজের বিস্তৃতি কতটা, এবং দ্বিতীয়ত বই কি এবং বই কি প্রকারে সাহায্য করতে পারে।

এমন অনেক ব্যক্তি আছে তারা কোন একটা বিষয়ে কিছু জানতে চায় কিন্তু তারা জানেনা গ্রন্থাগারে গেলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে পারে। কেউবা হয়তো জানে গ্রন্থাগারে গেলে আশা মিটতে পারে কিন্তু সে জানেনা গ্রন্থাগার থেকে কেমন করে বই নিতে হয়। এইরূপ বহু বিষয় আছে যে জন্যে গ্রন্থাগার প্রচারের প্রয়োজন আছে।

প্রচারের আর একটী উদ্দেশ্য হ'চ্ছে গ্রন্থাগারের কাজ বৃদ্ধি করা এবং বিস্তৃত করা। প্রচারের দ্বারা জনসাধারণ ক্রমশঃ যখন গ্রন্থাগারকে চিনবে, গ্রন্থাগারের সত্যিকারের কাজ কি তা যখন উপলব্ধি করবে। প্রচারের ফলে পাঠকদের সঙ্গে লেখকের যখন বইয়ের মধ্যস্থতায় পরিচয় হ'তে থাকবে তখন পাঠক বুঝবে গ্রন্থাগার কতটা কাজ করতে পারে। তখন জনসাধারণ গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যে, তার আয়ের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ দিতে মোটেই কুণ্ঠিত হ'বে না। জনসাধারণ যখন বুঝবে যে প্রয়োজন গ্রন্থাগার মেটাচ্ছে তা সত্যই মূল্যবান, তখন জনসাধারণ ক্রমশঃ আরো বেশী গ্রন্থাগার ব্যবহার করবে কেবল তাই নয় গ্রন্থাগার যা'তে আরো ভালোভাবে এবং আরও বেশী কাজ করতে পারে সেদিকেও তারা মন দেবে।

গ্রন্থাগার প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্য আমরা বলেছি জনসাধারণকে কেবল জানান দেওয়া—গ্রন্থাগার কি এবং বই কি অর্থাৎ :—

বই কি—কি সম্বন্ধে বই—বইয়ের সঙ্গে মানব জীবনের সম্বন্ধ কি—। বইয়ের কাজ—ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—নৈতিক—আর্থিক—আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে।

কেমন করে প্রত্যেকে তার জীবনের সঙ্গে বইয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। নিজের প্রয়োজনের জন্যে কেমন করে সে গ্রন্থাগার থেকে বই বেছে নিতে পারে।

গ্রন্থাগার কি—গ্রন্থাগারের কাজ কি। কে গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজ করছে—কোথা থেকে, কিভাবে গ্রন্থাগার অর্থ সংগ্রহ করে। কারা গ্রন্থাগার

ব্যবহার করতে পারে—কেমন করে তারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে—কোথায় গ্রন্থাগারের অবস্থিতি।

প্রচার কার্য্য আমরা যেমন ভাবেই করি না কেন—প্রচার কার্য্যের বিষয়বস্তু হ'বে উপরের ক'টী বিষয়।

প্রচার কার্য্য চালাবার উপায় হ'চ্ছে বিজ্ঞাপন—গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা-পোষ্টার—দৈনিক সংবাদপত্র—বক্তৃতা আলোকচিত্র ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার পরিচালনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে চিন্তা করবার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে—গ্রন্থাগারের একটা প্রধান চরিত্র হচ্ছে যে, গ্রন্থাগার মানুষের মত ক্রমবর্দ্ধমান। শিশু জন্মায়, সে বড় হয়, ক্রমশঃ তার যৌবন ও বার্দ্ধক্য আসে এবং শেষে আসে মৃত্যু—কখনও স্বাভাবিক মৃত্যু কখনও অকাল-মৃত্যু। গ্রন্থাগারের পরিচালনার অভাবে অকাল-মৃত্যু হতে পারে কিন্তু তার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। সুতরাং যত দিন যাবে, পুস্তকাগারের কলেবরও বাড়তে থাকবে।

কোন গ্রন্থাগারের পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে গেলে তা সব সময় ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। তা না করলে পরিচালনের ব্যবস্থাকে বার বার ভেঙ্গে গড়তে হবে।

আমরা এ প্রবন্ধে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে যা বলবো তা সকল প্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রযোজ্য, এমন কি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পক্ষেও তা কাজে লাগবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্য্যকে নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) বই কেনা বা সংগ্রহ করা।

(খ) পত্রিকার হিসাব রাখা।

(গ) বই দেওয়া ও ফেরৎ নেওয়া।

(ঘ) পুস্তকের যত্ন লওয়া।

গ্রন্থাগার পরিচালনার আরও অন্যান্য দিক আছে কিন্তু তাহা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করা ঠিক হবে না।

(ক) বই কেনা

নূতন বই যা-কিছু কেনা হয় তার বেশীর ভাগই প্রথম গ্রন্থাগারিকের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। পুস্তক নির্ব্বাচন করা বড় সোজা কাজ নয়। বই কেনা হলো অথচ সেই বই যদি কাজে না লাগে তাহলে সে রকম বই মঞ্চে ভরে রাখার কোন মানে থাকে না। পুস্তক নির্ব্বাচন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা পরে আর একটি প্রবন্ধ বলবো। এখানে কেবল এইটুকু মাত্র বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, যাদের জন্মে বই কেনা, তাদের কাজে লাগবে এরূপ বই যাতে কেনা হয়, সব সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

অধিকাংশ বইয়ের প্রস্তাব পাঠকদের কাছ থেকে আসে।

প্রস্তাব কার্ড

প্রস্তাবিত পুস্তকের বিবরণ নিম্ন অঙ্কিত একখানি কার্ডে লিখে রাখতে হয়। পাঠকদের প্রস্তাবের জন্য একখানি খাতা রাখা প্রয়োজন। পাঠক নিজে হাতে তার প্রস্তাব খাতায় লিখে দেবে। গ্রন্থাগারিক তাঁর নির্ব্বাচিত বইয়ের বিবরণ সরাসরি "প্রস্তাব কার্ডের" উপর লিখবেন। "প্রস্তাব কার্ডে" প্রস্তাবকারীর নাম ও ঠিকানা থাকা চাই, কারণ পাঠকের দ্বারা প্রস্তাবিত বই কেনা হলে, পাঠককে সে সংবাদ দেওয়া দরকার। তাতে পাঠককে বই পড়বার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

প্রস্তাব কার্ডের নমুনা

কার্ডখানির অপর পিঠে থাকবে প্রস্তাবকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রস্তাবের তারিখ।

পুস্তকের প্রস্তাবের জন্য পর পৃষ্ঠায় নমুনা অনুযায়ী কার্ড ছাপিয়ে রাখতে হয়। পুস্তকের প্রত্যেক প্রস্তাব অনুযায়ী কার্ডে লেখকের নাম, পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম ও মূল্য লেখা হলো। পরে কার্ডগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী একটি 'ট্রে'তে রাখতে হয়।

আজকাল পুস্তকাগারের যা কিছু কাজ সবই কার্ডের আর ট্রের দ্বারা হয়ে থাকে। খাতা লেখার পাট অনেকদিন উঠে গেছে, অবশ্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে এখনও খাতার প্রচলন রয়েছে, তার কারণ এদেশের জনসাধারণ এখনও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন নয়।

প্রস্তাব কার্ড

ডাক নং............প্রবেশ তাং............প্রবেশ নং......

লেখকের নাম...

বইয়ের নাম...............

প্রকাশকের নাম.........

মূল্য.........	কমিটির মত...... ...
অর্ডারের তাং......	বিক্রেতার নাম......
মূল্য দেওয়ার তারিখ...	মূল্য...

নিচের নমুনা অনুযায়ী একটি ট্রে'র প্রয়োজন। ট্রের ভিতর ৮টি খাপ থাকবে। প্রস্তাব-কার্ডগুলি যথাযথভাবে পরিপূরণ করে প্রথম খাপে রাখুন কমিটির অনুমোদনের জন্যে। যে বইগুলি কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হলো, সেই বইয়ের কার্ডগুলিতে কমিটির অনুমোদনের তারিখ দিয়ে দ্বিতীয় খাপে রাখুন! যে বইগুলি অনুমোদিত হলো না, সেগুলি "বাতিল"-এর ঘরে রাখুন।

এর পর বই কেনা আরম্ভ হলো। যে বইগুলি কিনতে হবে সেগুলির আর একখানি করে কার্ড লিখুন। কার্ডগুলি প্রস্তাব কার্ডের মতই হবে,

কেবল প্রস্তাবকের নাম-ঠিকানা কিছু থাকবার প্রয়োজন নেই। যে দোকান থেকে বই কেনা হবে, সেই দোকানের নাম দুইখানি কার্ডেই লিখুন। প্রথম কার্ডখানি তৃতীয় খাপে রাখুন এবং দ্বিতীয় কার্ডখানি অর্থাৎ দ্বিতীয় বার যে কার্ডগুলি লেখা হলো, সেগুলি একখানি পত্র সমেত বিক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দিন।



প্রস্তাব কার্ডের ট্রে

পত্রের নমুনা

মহাশয়!

পত্র-সংলগ্ন কার্ড অনুযায়ী বইগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। প্রত্যেক বইয়ের সহিত বইয়ের কার্ডখানি ফেরৎ দিবেন। প্রত্যেক বইএর মূল্য নির্দ্দেশ করা আপনার বিলের দুই প্রস্থ পাঠাইবেন। কোন পুস্তকের সংস্করণ নির্দ্দেশ করা না থাকলে পুস্তকের নবতম সংস্করণ পাঠাবেন।

ইতি—

গ্রন্থাগারিক।

এবার বই আসতে আরম্ভ হলো। বই যেমন যেমন আসবে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভিতরের কার্ডগুলি তৃতীয় খাপে রাখা কার্ডগুলির সহিত মিলিয়ে দুইখানি কার্ডেই পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও প্রবেশ নম্বর লিখে তৃতীয় খাপের কার্ডগুলি চতুর্থ খাপে রেখে বইগুলি পুস্তকের জাতি-বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিন। বইয়ের সহিত যে কার্ডগুলি ফেরৎ আসছে সেগুলি

একটি ট্রের ভিতর পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও প্রবেশ নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন। এ কার্ডগুলি পরে কাজে লাগবে।

যে বইগুলি জাতি-বিচারের জন্য পাঠানো হলো, সেগুলি ফেরৎ এলে বইগুলির ডাকনাম তুইখানি কার্ডে লিখে চতুর্থ খাপের কার্ডগুলি পঞ্চম খাপে রেখে বইগুলি পাঠিয়ে দিন তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য।

বইগুলি তালিকা প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলে, পঞ্চম খাপের কার্ডগুলিতে ও অন্য ট্রে'তে রাখা কার্ডগুলিতে তালিকা প্রস্তুতের তারিখ (তালিকা কার্ডের পিছনে থাকবে) বসিয়ে দিন। এখন বইখানি আপনার পুস্তকাগারের মজুত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো। বইয়ের প্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে পুস্তকের তালিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বই সম্বন্ধে সমুদয় সংবাদ সমন্বিত হয়ে আপনার হাতে প্রত্যেক বইয়ের দরুণ তু'খানি করে কার্ড জমলো।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পরিচালনার জন্য তু'টি তালিকা রাখা একান্ত প্রয়োজন :—১। পুস্তকাগমনের তালিকা ও ২। মঞ্চ-তালিকা। মঞ্চ তালিকার কথা আমরা পরে বলবো।

১। পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকা : এই তালিকা থেকে শেষ বইখানির সংখ্যা দেখে বলা যায়, আজ পর্য্যন্ত পুস্তকাগারে কত বই কেনা হয়েছে। শেষ সংখ্যাটি যে পুস্তকাগারের পুস্তক-সংখ্যা নির্দ্দেশ করবে তার কোন মানে নেই, কারণ পুস্তকাগারের বই মাঝে মাঝে বাতিল করা হয়। তবে অনুমানিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করে বলতে পারেন।

বইয়ের আগমনের সংখ্যা কার্ডের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই কেনার কাজ শেষ হলো। এইবার কার্ড তু'খানির একখানিকে পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকারূপে ও আর এক-খানিকে শেল্‌ফ তালিকারূপে ব্যবহার করুন।

এই তু'টি তালিকা কাজের উপযোগী করে রাখবার জন্য টানা দেওয়া তু'টি দেরাজ চাই :—

পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকা

(খাতা)

১

তারিখ	ক্রমিক সংখ্যা	লেখকের নাম	বইয়ের নাম ও সংস্করণ	প্রকাশক	প্রকাশের তারিখ
২৬.১.৫৪	১২৩৪৫	রাজকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ	ইভেৎ (১ম সং)	ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ	১৯৫৪ ইং

খাতার বামদিকে থাকবে।

২

বিক্রেতা বা দাতার নাম	প্রঃ মূল্য	ক্রয় মূল্য	বিলের নম্বর ও তারিখ	পুঃ সংখ্যা খণ্ড	মন্তব্য
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ	২\	১৸৹	১৬. ২. ৫৪	৮৯১, ৪৪৩ র ১২	

খাতার ডানদিকে থাকবে।

একটি দেরাজে প্রত্যেক বইয়ের কার্ড পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন।



আর একটি দেরাজে কার্ডখানি পুস্তকের জাতীয়সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন।

এক কাজে দু'কাজ শেষ করার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিচালনার বেশীর ভাগ কাজই কার্ড-ট্রে-দেরাজ এই পন্থায়হয়ে থাকে।

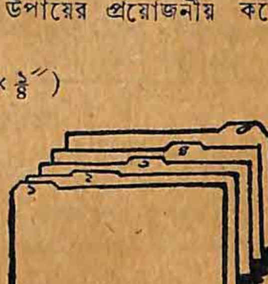
২। বই দেওয়া-নেওয়া

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখার নানাবিধ উপায় আছে। যে রকম উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, বই দেওয়া-নেওয়ার উপায় থেকে অন্তত তিনটি বিষয় প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে জানতে পারা যাওয়া চাই। ১। কার কাছে বই আছে ; ২। কি বই কার কাছে আছে ; ৩। কি বই কখন কে ফেরৎ দেবে।

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখবার উপায়ের প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ :—

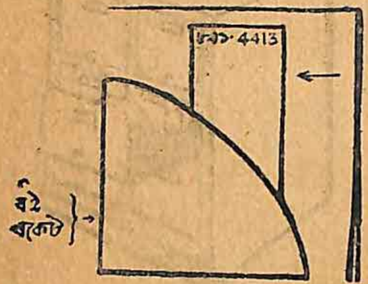
(ক) নির্গত বইয়ের ট্রে (১৯″ × ২½″ × ⅛″)

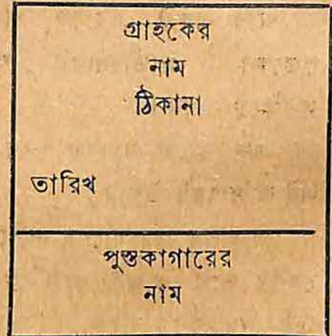
(খ) তারিখ নির্দ্দেশক। প্রতি দিনের নির্গত বইয়ের পরিচয়-পত্র এই তারিখ-নির্দ্দেশক গুলির পিছনে, পুস্তকের জাতিবিচারের সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়।



(গ) কার্ডের ঠেকনা। কার্ডগুলিকে সোজা করে রাখবার জন্য ট্রের ভিতর ঠেকনা রাখার প্রয়োজন হয়।

(ঘ) পুস্তকের পরিচয়-পত্র ঃ একখানি ২″×১½″ পরিমিত পুরু শক্ত কার্ড বইয়ের পিছনের মলাটের ভিতর দিকে রাখা থাকবে। পরিচয়পত্রের





উপর লেখকের নাম বইয়ের নাম ও বইয়ের নম্বর থাকবে। এই কার্ড-খানিকে একটি ট্রের ভিতর নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখলেও চলে।

(ঙ) গ্রাহকের পরিচয়পত্র ঃ পরিচয়-পত্রে গ্রাহকের নাম-ঠিকানা ও প্রয়োজন হলে গ্রাহকের নম্বর ও নিচের দিকে পুস্তকাগারের নাম। কার্ডের নিচের দিক থেকে কিছু উঁচুতে একটি পকেট।

(চ) বইয়ের প্রচ্ছদপটের ভিতর দিকে একটি তারিখ-নির্দ্দেশক পত্র থাকবে। এই পত্রের উপর বই-নির্গমন সম্পর্কে নিয়ম লেখা থাকবে।

তারিখ-নির্দ্দেশক-পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। ১৫ দিনের বেশী রাখলে সপ্তাহে এক আনা হারে জরিমানা দিতে হবে।

এইবার মনে করুন আপনি বই দিচ্ছেন। গ্রাহক একটি ছাপা কাগজে তার কি বই চাই লিখে দিল। এই কাগজখানি এইরূপ হবে :—

পুস্তকাগারের নাম

পুস্তক প্রার্থনা-পত্র

লেখক...

বইয়ের নাম..........................

বইয়ের নম্বর.............

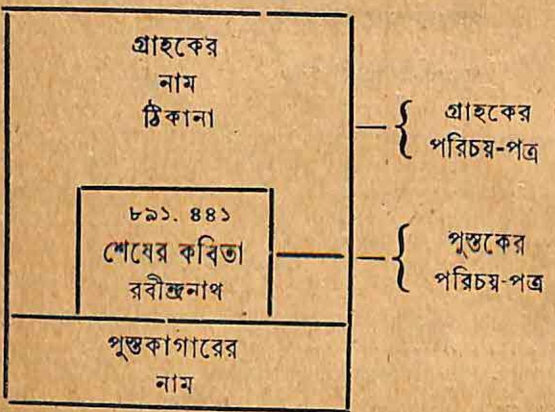
গ্রাঃ নাম..................

ঠিকানা..

গ্রাহক নং................ তারিখ...............

বইখানি আপনার কাছে এলো। আপনি বইখানির পিছন দিক হ'তে বইয়ের পরিচয়-পত্র খানি খুলে নিলেন। পুস্তকের পরিচয়পত্র যদি বইয়ের ভিতর না রেখে ট্রেতে রাখা হয়, তাহলে ট্রেখানি আপনার পাশেই থাকবে এবং সেই ট্রের ভিতর পুস্তকের পরিচয়পত্রগুলি বইএর নম্বর অনুযায়ী সাজান আছে। বইখানির নম্বর দেখে, ট্রে থেকে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিন। গ্রাহকের পরিচয়-পত্রখানি চেয়ে নিন। তার পর বইয়ের প্রচ্ছদপটে আঁকা তারিখের লেবলে যেদিন বই ফেরৎ দিতে হবে সেই দিনের তারিখ দিয়ে বইখানি গ্রাহককে দিয়ে দিন। তার পর গ্রাহকের টিকিটের পকেটে বইয়ের টিকিটখানি রেখে, মিলিত পত্র দু'টি তারিখ নির্দ্দেশকের পিছনে রেখে দিন। পুস্তকাগার বন্ধ হবার আধ ঘণ্টা আগে মিলিত পত্রগুলিকে নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে ট্রের পিছন দিকে রেখে দিন। ট্রের পিছন দিকে নতুন ও

সামনের দিকে ক্রমশঃ পুরাতন তারিখের মিলিত পত্রগুলি থাকবে। ফলে যেদিন যে বই ফেরৎ আসবার কথা, সেই সেই বইয়ের মিলিত পত্রগুলি আপনা থেকে সমুখে এসে পড়বে। সকালে পুস্তকাগারে এসে সামনের তারিখ-



নির্দ্দেশক পত্রের পিছনে যে মিলিত পত্রগুলি পাবেন, সেগুলি বার করে নিয়ে গ্রাহককে পত্র দিন। চিঠিখানি একটু মিষ্টি করে লিখবেন। রূঢ়তা যেন একটুও থাকে না। জরিমানার কথা, চিঠি পাঠানর খরচা সবই লিখবেন কিন্তু সবই মিষ্টি করে লিখবেন। চিঠিতে বিন্দুমাত্র হুকুমের ভাব থাকলে গ্রাহক চটে যাবে।

বই দেওয়ার কাজ তো শেষ হলো। এইবার বই ফেরৎ নেওয়া। গ্রাহক বই নিয়ে এলো। আপনি মিলিত পত্রখানি বার করে নিয়ে, বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে গ্রাহকের পরিচয়-পত্র গ্রাহককে ফিরিয়ে দিয়ে, বইয়ের পরিচয় পত্রখানি যথাস্থানে রেখে দিন। এইখানেই বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ শেষ হলো। একটি কথাও আপনাকে লিখতে হলো না অথচ কার কাছে কি বই আছে এবং কবে বইখানি ফেরৎ আসবে, তার সব সন্ধানই আপনার কাছে রইলো।

° গ্রাহক যে কাগজে বইয়ের জন্য প্রার্থনা করল, সে কাগজগুলি এইবার নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলুন। প্রতি মাসের শেষে এই কাগজগুলির (প্রার্থনা-পত্র) সাহায্যে পুস্তক নির্গমনের বিবরণী তৈরী হবে। পুস্তক নির্গমনের বিবরণী অতি প্রয়োজনীয়—**ইহা সাধারণের পুস্তক-চাহিদার মাপকাঠি।**

গ্রাহকের নাম রেজেষ্ট্রী

কেহ গ্রাহক হইতে চাহিলে তাকে প্রথমে একটি আবেদন করতে হবে। আবেদন-পত্রখানি পূরণ করে দেবার পর গ্রাহককে একখানি পরিচয়-পত্র দেওয়া হবে। সেই পরিচয়পত্রে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও নম্বর থাকবে। গ্রাহকের নম্বর হবে আবেদন-পত্রের ক্রমিক নম্বর।

পুস্তকাগারের নাম

(গ্রাহক হবার আবেদন-পত্র)

পূরা নাম ....

ঠিকানা ....

কর্ম্মস্থলের ঠিকানা ....

তারিখ..

গ্রাহক নং...............জমা.................তারিখ...............

আমি গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সম্বন্ধে সমুদয় নিয়ম পড়িয়া পরিচয়-পত্রের জন্য আবেদন করিলাম। গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সম্বন্ধীয় সমুদয় নিয়ম মানিতে বাধ্য রইলাম।

গ্রাহকের আবেদন-পত্রগুলি নামের বর্ণমালা অনুযায়ী একটি দেরাজের টানায় সাজিয়ে রাখুন।

গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সাধারণতঃ প্রতি বৎসর নূতন করে করে নিতে হয় এবং নতুন করে নেবার সময় গ্রাহককে নূতন করে আবেদন করতে হয়। গ্রাহকের নম্বর প্রতিবার নতুন করে না করে একই নম্বর বছরের পর বছর চালানো যায়। এরূপ করতে হলে নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী একখানি খাতা ব্যবহার করতে হয়।

	১৯৪৮ নাম	১৯৪৯ নাম	১৯৫০ নাম
১	অক্ষয় নন্দী	অক্ষয় নন্দী ১, ডিসেম্বর	অক্ষয় নন্দী ৪, নভেম্বর
২	অমলেন্দু দেব	চন্দ্রনাথ বন্দ্যো ৪ঠা আগষ্ট	
৩	চিত্ত বন্দ্যো		
৪			

আবেদন-পত্রের নাম প্রথম সারির যে নং খালি আছে সেই নম্বরে লিখুন। এই নম্বরটী আবেদন-পত্রে ও গ্রাহকের পরিচয়-পত্রে দিন। তারিখ লিখুন নামের উপরে। অক্ষয় নন্দী যখন তার পরিচয়-পত্র নতুন করে নিলে, ২য় সারিতে তারই নংএ তার নাম লিখুন, তারিখ দিন তার নামের নিচে। অমলেন্দু দেব নতুন করে গ্রাহক হলো না, তার স্থানটি নতুন কোন

গ্রাহককে দিন এবং নতুন গ্রাহকের নামের উপর তারিখ দিন। চিত্ত বন্দ্যো নতুন করে গ্রাহক হবার জন্যে এখনও আবেদন করেনি—আবেদন করবার সময় আছে, সেই জন্য তার স্থান খালি পড়ে আছে।

যে পরিচয়-পত্রগুলি নতুন করা হলো না, সেই সব গ্রাহকের আবেদন-পত্র নষ্ট করে ফেললেই কাজ মিটে গেল এবং তাদের পরিচয়-পত্রের স্থলে নূতন আবেদনকারীদের আবেদন-পত্রগুলি নাম রেজিষ্ট্রির নম্বর সমেত রেখে দিন।

পরিচয়-পত্র নতুন করে নেবার নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও অন্ততঃ আরও তিন মাস অপেক্ষা করার পর তবে গ্রাহকের নাম কেটে দিতে হয়।

পত্রিকার হিসাব

সাধারণ ছোট-খাটো পুস্তকাগারে যেখানে কয়েকখানা মাত্র পত্রিকা নেওয়া হয় সেখানে পত্রিকার হিসাব রাখা এমন কিছু একটা সমস্যা নয়, কিন্তু বড় বড় পুস্তকাগারে কিংবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাগারে পত্রিকার হিসাব রাখা একান্ত দরকার। কোন পত্রিকা যথাসময়ে এলো কিনা, পত্রিকা না আসার জন্য প্রকাশককে পত্র লেখা, কোন পত্রিকার কত খণ্ড আছে—কোন খণ্ড নাই এ সমুদয় সংবাদ নথ-দর্পণে থাকা চাই।

পত্রিকার হিসাব রাখবার জন্য প্রয়োজন পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় নমুনা অনুযায়ী ছাপা কার্ড, আর একটি ট্রে। প্রত্যেক কার্ডে উপরের নমুনা অনুযায়ী পত্রিকার বিবরণ লেখা থাকবে। দৈনিকের কার্ডগুলি ট্রের "দৈনিকের" খাপে, সাপ্তাহিক "সাপ্তাহিকে'র খাপে থাকবে।

দৈনিকের বেলা কার্ডের ঘরগুলি উপর নিচে ব্যবহার করুন এবং প্রতিদিন যেমন কাগজ পাচ্ছেন একটি করে × চিহ্ন দিন।

(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায়)

পত্রিকার নাম প্রকাশ-কাল

প্রঃ তারিখ মুল্য প্রকাশক

বৈশাখ—চৈত্র সূচি চৈত্র

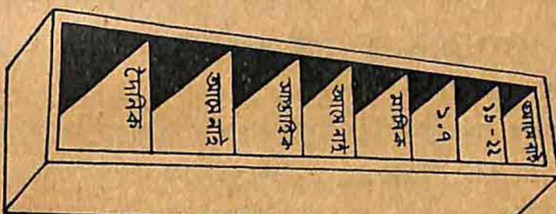
	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১৯৫০	দৈ			× × সা × ×	× × প্রা × ×	× × হি × ×	× × ক × ×					
১৯৫১	নি				মা ×	সি ×	ক ×	প ×	ত্রি ×	কা ×	×	×
১৯৫২	ক											
১৯৫৩												

দৈনিক পত্রিকার হিসাব একখানি কার্ডের উপর দুই বৎসরের রাখা যাবে।

সাপ্তাহিকের বেলায় ঘরগুলি আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার. করুন।

মাসিক পত্রিকার বেলা প্রতি ঘরে একটি করে × দিয়ে দেওয়া মাত্র কাজ।

যে দিনের, যে সপ্তাহের ও যে মাসের যে কাগজ এলো না, সেই কাগজের কার্ডখানি তুলে নিয়ে "আসে নাই" ঘরে রাখুন এবং প্রকাশককে তাগিদ-পত্র দিন।



প্রতিদিন সকালে এসে একবার করে পত্রিকার ট্রে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কি কাগজ আসতে বাকি আছে। মাসিক পত্রিকার খাপ; দু'টি- একটি ১ হতে ৭ তারিখের মধ্যে যে পত্রিকাগুলি আসে, আর একটি ১৬ হতে ২২ তারিখের মধ্যে যে সব পত্রিকা আসবে, আর একটি ২৩ হতে ৩১ ঘর থাকলে ভালো হয়। পত্রিকা পাবার আনুমানিক তারিখ কার্ডের উপর লেখা থাকবে এবং তারিখ অনুযায়ী কার্ডগুলি তারিখের খাপে থাকবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পুস্তক সংগ্রহ

দান গ্রহণের দ্বারা বেশী পুস্তক সংগ্রহ হয় না সত্য, কিন্তু জনসাধারণের দান পুস্তকাগারে গ্রহণ করা সময়ে সময়ে বিশেষ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণের কাছ থেকে দান গ্রহণের দ্বারা খুব বেশী মূল্যবান বই পাওয়া না গেলেও, জনসাধারণের কাছে দানের জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত, এবং তাদের দানে পুস্তকাগার যে বিশেষ উপকৃত হবে এ বিষয়েও জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু মনে রাখবেন, দান করার চেয়ে দান গ্রহণ করা অনেক সমস্যাজনক। সেই জন্যে দান গ্রহণ করা না করার ক্ষমতা গ্রন্থাগার কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। দান করে অনেকে মনে করেন পুস্তকাগার সাধারণের কাছে দাতার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখে দেবে, কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে যান যে, বিংশ শতাব্দীর পুস্তকাগারে খুব কম বই চিরস্থায়ী হয়। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুস্তকের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। যে বইয়ের কোন মূল্য নেই এমন বই আজকালকার পুস্তকাগারে রাখার মানে থাকে না।

বই কেনার সময় আমরা যে উপায় অবলম্বন করেছি, এখানেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করা দরকার। দান গ্রহণের দ্বারা যে বইগুলি পুস্তকাগারে আসবে সেগুলির একখানি করে কার্ড লিখে ফেলুন। এ কার্ডগুলি রঙীন কার্ড হলে ভালো হয়, তাতে কার্ডগুলি দেখলেই বোঝা যাবে দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইয়ের কার্ড। ছোট-খাটো পুস্তকাগারে বই কেনার ট্রেই দান গ্রহণের ট্রে হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বড় পুস্তকাগারে "দান গ্রহণের" একটি আলাদা ট্রে ব্যবহার করলে ভালো হয়।

"বই কেনা"র কার্ডগুলি যেমন এক এক ধাপ উঠে শেষ পর্য্যন্ত 'দৈনন্দিন" পুস্তকাগমনের তালিকা হিসাবে ব্যবহার হয়, "দান-গ্রহণের" কার্ডগুলিরও ঠিক সেইরূপ ধাপে ধাপে উঠে শেষে পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকা হিসাবে ব্যবহার হবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইগুলির জন্য গ্রন্থাগারে আলাদা কোন স্থান ঠিক না করাই ভালো। পুস্তকাগারের সাধারণ পুস্তকসম্ভারের সঙ্গেই সে বইগুলিকে স্থান দেওয়া উচিত এবং সে বইগুলির আলাদা কোন তালিকা

না করে সাধারণ তালিকাভুক্ত করা ভালো। তবে যে ক্ষেত্রে দান মূল্যবান এবং পুস্তকের সংখ্যা বেশী, সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ দানের ও দাতার মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত।

বইয়ের যত্ন*

পুস্তকাগারের আয়ের শতকরা সাত ভাগ বই বাঁধাই করতে খরচ হয়। পাঠকদের ও পুস্তকাগারের কর্ম্মীদের গাফিলতির জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বইয়ের ক্ষতি হয়ে যায়, সেই কারণে পাঠকদের ও কর্ম্মীদের বইয়ের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা নেওয়া দরকার।

বই খোলা : প্রথম দুই হাতের অনামিকা ও মধ্যমার দ্বারা কয়েকখানি পাতা-সমেত বইয়ের মলাট ধরে মলাট দুইখানিকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলুন ঠিক সেই অবস্থায় বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আর কিছু পাতা আলগা করে ধরুন। বইখানি আবার খুলুন—বইয়ের মাঝামাঝি এসে পড়লেই কাজ শেষ হলো।

পাতা কাটা : পাতা কাটবার জন্য খুব ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে নেই। প্লাষ্টিকের বা হাড়ের বই কাটা ছুরি ব্যবহার করা ভালো। পাতাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বইয়ের শিরদাঁড়া পর্য্যন্ত কাটবেন—একটুও বাকি যেন না থাকে। বইয়ের পাতা কাটবার জন্যে পাঠক যত্ন নেবে না, সমুখে যা পাবে তাই দিয়ে সে পাতা কাটবে।

পত্র-নির্দ্দেশক : বইয়ের পাতা মোড়া, পাতার কোণ মোড়া, দাঁত-খোঁটার কাটি পাতার মধ্যে রাখা পাঠকদের অভ্যাসগত দোষ। "পাতা মুড়িবেন না" এ কথা পাঠকদের বলায় কোন লাভ নেই। পাঠকদের

*বইয়ের যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আমরা আর একটি পরিচ্ছেদে বলেছি।

অভ্যাস দূর করতে গেলে তাদের অভাব দূর করতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে একটি করে পত্র-নির্দ্দেশক দিতে হয়। প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে পত্র-নির্দ্দেশক দেওয়া বিশেষ কিছু কষ্টকর নয়। প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন-ছাপা পত্র-নির্দ্দেশক প্রকাশকদের কাছ থেকে চাইলেই পাওয়া যায়।

মঞ্চ থেকে বই বার করা



মঞ্চে খুব ঠেসে বই রাখতে নেই।

ঠেসে বই রাখলে তাড়াতাড়ি বই বার করবার সময় পাশের ছবির মত বইয়ের অবস্থা হয়।

মঞ্চ হতে বই বার করবার সময় পাশের ছবিতে বই বার করা যেমন দেখান আছে তেমনি ভাবে বার করতে হয়।



বই ধরবার নিয়ম



এই ছবির মত বই ধরলে বইয়ের সেলাই কমজোরী হয়ে যায়, ফলে পাতাগুলি আলগা হয়ে যায় এবং শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।

ধুলা : বইয়ের ধুলা ঝাড়া একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ। মনে রাখবেন,

ধূলা ঝাড়তে হয়—ঘসতে নাই। ধূলা ঝাড়বার জন্য ব্রাশ ব্যবহার করা ভালো। ঝাড়ন ব্যবহার করলে ধূলা বইয়ের পাতার ভিতর ঢুকে যায়।

আর্দ্রতা : বইয়ের মঞ্চ কখনও দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে নেই। মঞ্চের পিছন দিকে হাওয়া যাতায়াত করবার যথেষ্ট স্থান থাকা দরকার। শেল্‌ফের নিচেকার থাক মাটি থেকে অন্তত ১½´ ফুট উঁচু হওয়া চাই। আর্দ্রতা বইয়ের বাঁধাই, প্রচ্ছদপট, প্রচ্ছদপটের রং, বইয়ের পাতার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

ধোঁয়া : মঞ্চের ঘরের ভিতর ধূমপান করা নিষেধ থাকা চাই, তাতে অগ্নিভীতি অনেকটা দূর হয়। আর মনে রাখবেন, তামাকের ধোঁয়ায় বাঁধাই করা বইয়ের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

আলো ও উত্তাপ : বইয়ের উপর সোজাসুজি ভাবে আলো পড়লে বইয়ের উপর উত্তাপ বেশী লাগে—তাতে বই বাঁকিয়া যায় এবং বইয়ের নমনীয়তা ও রং খারাপ হয়ে যায়।

বইয়ের ঠেকনা : আমরা আগেই বলেছি, শেল্‌ফে বেশী ঠেসে বই রাখতে নেই। অনেক সময় একখানি বই টেনে বার করতে গিয়ে শেল্‌ফ-শুদ্ধ বই মাটিতে পড়ে যেতে পারে। নূতন বইকে স্থান দিবার জন্য শেল্‌ফে সব সময় কিছু জায়গা রাখতে হয়। শেষের বইখানিকে খাড়া করে রাখবার জন্য একটা ঠেকনা ব্যবহার করা দরকার।

বই সারা : কোন পাতা ছিঁড়ে গেলে জোড়া দেওয়া, একটি ছবির প্লেট খুলে গেলে তা পুনরায় জোড়া দেওয়া, এই সব সামান্য কাজ পুস্তকাগারের কর্ম্মীদের সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলা দরকার।

বই বাঁধাই

বই বাঁধাই দপ্তরীর কাজ, কিন্তু যিনি বই বাঁধাতে দিবেন তাঁর বই বাঁধাই সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান চাই। কোন্ বইয়ের কিরূপ বাঁধাই হওয়া

দরকার, নিদর্শন অনুযায়ী বাঁধান হলো কি না, যুজ শেলাইয়ের জায়গায় ফুঁড়ে শেলাই করা হয়েছে কি না, এ সব বিষয় তাঁর জানা প্রয়োজন। পুস্তক বাঁধাই সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলবো না, কারণ পুস্তক বাঁধাই হচ্ছে পুস্তক বিজ্ঞানের অঙ্গ। এখানে কেবল আমরা বলবো বই বাঁধতে দেওয়া ও তা ফেরৎ নেওয়ার হিসাব রাখার কথা :

বই বাঁধতে দেওয়ার সময় দপ্তরীকে জানিয়ে দিতে হয় কোন্ বইখানি কি রকম বাঁধাই হবে।

বই বাঁধাইয়ের হিসাব রাখবার জন্য প্রয়োজন একটি ট্রে ও কতকগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী ছাপা কার্ড :—

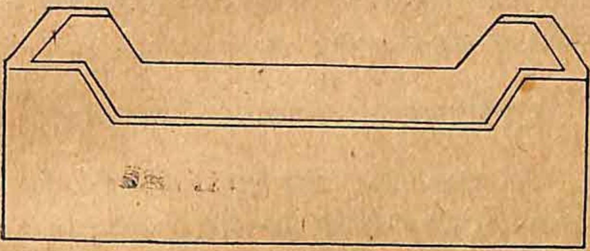
গ্রন্থাগারের নাম

ছাপার আদর্শ.................	ক্রমিক নং..................
রং...............	শিরদাঁড়ার রং..............
মূল্য...............	তারিখ......................

	৮৯১.৪৪৩ শ ২২২			শরৎচন্দ্র	শ্রীকান্ত

বই বাঁধাই করতে পাঠাবার আগে বইয়ের ভিতর হতে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে একটি ট্রের ভিতর রাখুন।

প্রত্যেক বইয়ের জন্য উপরের নমুনা অনুযায়ী দুইখানি করে কার্ড করুন, একখানি বইয়ের সঙ্গে দপ্তরীকে দিয়ে দিন। আর যে কার্ডখানি নিজের কাছে রাখলেন, তার পিছনে দপ্তরীর বা তার প্রেরিত লোকের স্বাক্ষর করে নিন। পরে কার্ডগুলিকে ক্রমিক নম্বর অনুয়ায়ী একটি ট্রের ভিতর সাজিয়ে রাখুন।



বাঁধাই কার্ড রাখিবার ট্রে

বই ফেরৎ এলে আপনার কাছে-রাখা কার্ডের বিবরণের সহিত বই মিলিয়ে নিয়ে, বইয়ের ভিতর পুস্তক পরিচয়-পত্রখানি যথাস্থানে রেখে দিন। এবার বই মঞ্চে পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রতি বৎসরের শেষে বই বাঁধাই করতে কত খরচা হলো তার হিসেব করা হলে বই বাঁধাইয়ের কার্ডগুলি নষ্ট করে ফেলতে পারেন।

পুস্তক নির্গমনের তুলনামূলক হিসাব

কোন্ জাতীয় বই কত বার হচ্ছে তার একটা তুলনামূলক হিসাব প্রতি বৎসর করা প্রয়োজন। কোন্ জাতীয় বই কি রকম ব্যবহার হচ্ছে, কোন্ জাতীয় বই পুস্তকাগারে আরও বেশী রাখা দরকার, গ্রাহকের সংখ্যা অনুযায়ী বইয়ের চাহিদা হচ্ছে কি না, কোন্ বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, বইয়ের ব্যবহার অনুযায়ী পুস্তকাগারে কাজ হচ্ছে কি না, কর্মী কমানো বা বাড়ানো প্রয়োজন কি না, এ সব বিষয়ই পুস্তক নির্গমনের

হিসাব থেকে বোঝা যায়। পুস্তক নির্গমনের হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আমরা পুস্তক নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বলবো।

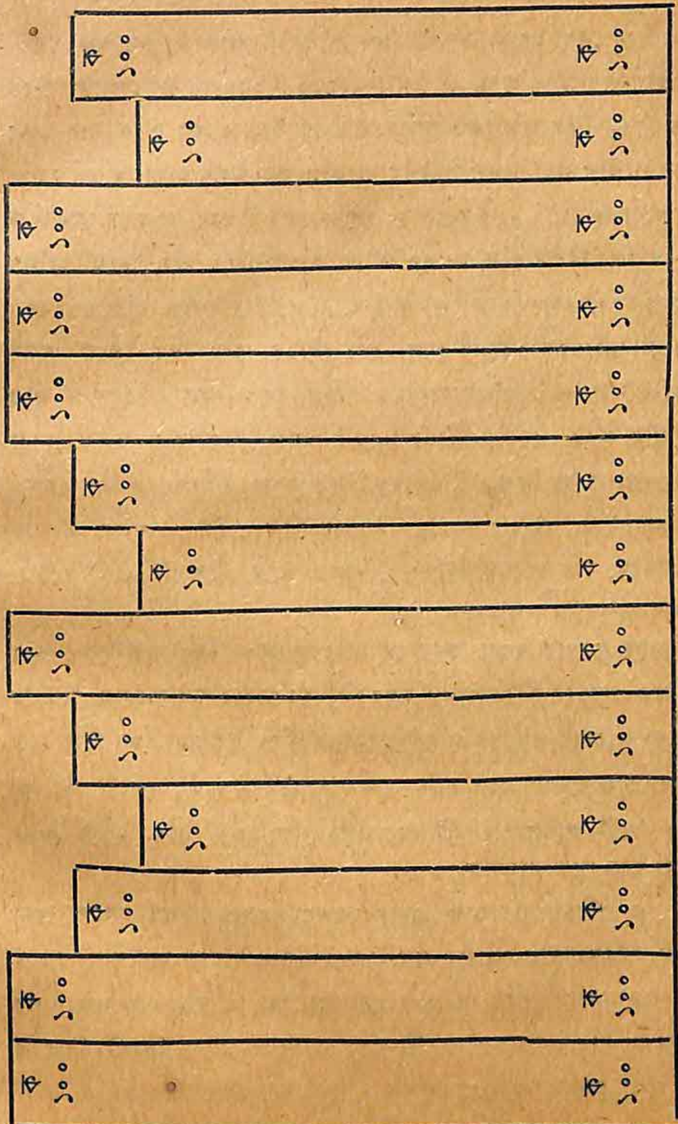
মনে রাখতে হবে পুস্তকাগার সাধারণের, সেই জন্যে সাধারণের সব সময়ে জানবার অধিকার আছে তাদের পয়সা কি রকম ব্যয় হ'চ্ছে। প্রতি বৎসরে বই নির্গমনের হিসাব, গ্রাহকের হিসাব এবং পুস্তকাগারের কর্ম্মীদের কাজের হিসাব ছাপিয়ে বার করা প্রয়োজন।

পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া

প্রতি বৎসর পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া দরকার। মঞ্চ-তালিকার সঙ্গে, মঞ্চে সঞ্চিত বই, নির্গত বইয়ের তালিকা ও যে-সকল বই বাঁধাই করতে দেওয়া হয়েছে তা মিলিয়ে, দেখতে হয় কি কি বই হারালো বা কি কি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই জন কর্ম্মচারীর দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয়। এক জন মঞ্চে রক্ষিত বইয়ের নাম ডাকতে থাকে আর এক জন শেল্‌ফ-তালিকার কার্ডগুলি নামের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে থাকে। মঞ্চে বইগুলি ঠিক যে হিসাবে সাজানো আছে, মঞ্চতালিকার কার্ডগুলিও ঠিক সেই হিসাবে সাজানো থাকে, সেই জন্যে মিলাবার কোন অসুবিধা হয় না। যে বইখানির নাম ডাকা হলো না, সেই বইয়ের কার্ডখানির উপর একটি × দাগ দিলেই হলো। মঞ্চের বই মেলানোর পর, পুস্তক নির্গমনের তালিকা ও বই-বাঁধাইয়ের তালিকার সঙ্গে শেল্‌ফ-তালিকা মেলানো হলো। পরে যে কার্ডগুলোর উপর × চিহ্ন রইলো, সেইগুলির একটি তালিকা করে ফেললেই পুস্তক-সম্ভারের হিসাব সম্পূর্ণ হলো।

বইয়ের শিরদাঁড়ায় ডাক নং লেখা

ডাক নং লেখা দু'রকম ভাবে হয়ে থাকে। সোজাসুজি বইয়ের আবরণের



ক/১০০ নং বইয়ের উপর দিকে লিখলে ও নিচের দিকে লিখলে মঞ্চে সাজানো বইগুলিকে কিরূপ দেখতে হয়।

উপর কালি দিয়ে লেখা হয়, না হয় আলাদা চৌকা বা গোল না হয় অন্য কোন আকারের কাগজের উপর ডাক নং লিখে বইয়ের শিরদাঁড়ার উপর আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। কিন্তু কাগজের ডাকনাম ফলক শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় এবং অনেক সময় পালিশ করা চামড়ার উপর বা কাগজের উপর মারা মুস্কিল হয়—ঠিক আটকে থাকে না। সেই জন্যে যে স্থানে ফলকটি মারা হবে সে স্থানটিকে বেশ করে ভিজিয়ে নিতে হবে, না হয় শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘসে নিয়ে পালিশ তুলে ফেলতে হবে, তার পর ভালো করে আঠা লাগিয়ে ফলক মারতে হবে। ফলকের সংখ্যাগুলি এক রকমের হলে, এবং বইয়ের তলা দিক থেকে একই দূরত্বে থাকলে শেল্‌ফ-এর সৌন্দর্য্য বাড়ে। নিচের দিক থেকে ১" হতে ৩" দূরে ফলকগুলি মারা হয়। মোটা বইয়ের পিছনে অর্থাৎ শিরদাঁড়ায় ফলক আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু চটি বইয়ের পিছন দিকে উপরের দক্ষিণ কোণে (উপরের মঞ্চ হ'তে বই বার করার নিয়মের ছবি দেখুন) লেবেল মারতে হয়; তার কারণ, কত নম্বরের বই তা দেখবার জন্যে বইখানি একটু টেনে বার করলেই নম্বর চোখে পড়বে।

বই বাঁধতে দেবার সময় স্বর্ণাক্ষরে বইয়ের ডাক নম্বর ছাপিয়ে নেওয়া ভালো। কম খরচায় বইয়ের ডাক নম্বর লিখিয়ে নেবার উপায় হচ্ছে "Stylo lectric" কলম ব্যবহার করা। গায়ের চামড়ায় উল্কি পরানর মত ঠিক এই কলমের দ্বারা কাজ হয়। সাত রকম রঙ্গে ছাপা ½" কাগজের গোটা পাওয়া যায়। এক একটি গোটায় ১২০০টি ডাক নম্বর লেখা হয়। এক একটি ডাক নম্বর লিখতে খরচ পড়ে নামমাত্র।

পুস্তকাগার পরিচালনার কথা এখানে শেষ হলো। শেষ জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিচালনার অভাবে পুস্তকাগারের নাম খারাপ হয়ে যায়, গ্রাহক বিরক্ত হয়ে পুস্তকাগারে আসে না, এবং পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য—জনসাধারণের সেবা—সফল হয় না। পুস্তকাগার ঠিকমত চালাতে গেলে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার: শৃঙ্খলা, তৎপরতা, কর্ত্তব্যবোধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গ্রন্থাগার সংগঠন

বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, কোন সংঘে, এবং শিল্প, বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন অঙ্গে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, কারণ সে সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। যেখানে উদ্দেশ্য সুনির্দ্দিষ্ট সেখানে যে কোন প্রকারে অর্থেরও সংগ্রহ হ'য়ে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে উদ্দেশ্য কি ?

যদি ধরে নেওয়া যায় জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত করা, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার মান কি নির্ণয় করা সম্ভব ? একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয় কারণ সেখানে পাঠক সমাজের পড়ার একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য কিছু স্থির করতে পারা যায় না। উপরন্তু অর্থ সংগ্রহ হ'বে কোথা থেকে ? রাষ্ট্রের কাছে হাত পাততে গেলে, রাষ্ট্র বল্‌বে "শিক্ষার জন্যে সকল ব্যবস্থা তো আমরা করেছি আর খরচা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" সুতরাং জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে উঠার মূলে দুটী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা :

প্রথমতঃ—জনসাধারণের গ্রন্থাগার কি উদ্দেশ্যে গড়ে উঠবে ?

দ্বিতীয়তঃ—অর্থ আসবে কোথা থেকে ?

কোন দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যায়, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়েই

কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি, গ্রন্থাগারের ভিত গাড়ে এবং সে গ্রন্থাগার চালাবার জন্যে তাদের জনসাধারণের দ্বারে গিয়েই অর্থের জন্য হাত পাততে হয়। এবং আজ পর্য্যন্ত যা কিছু গ্রন্থাগার আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে তা জনসাধারণের অর্থেই এবং কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তিদের উৎসাহে। রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে আজ পর্য্যন্ত কোন জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করেছে কিনা সন্দেহ। যেখানে রাষ্ট্র নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারকে সাহায্য করে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গ্রন্থাগার আর জনসাধারণের থাকে না।

গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রচার হ'লেও ক্রমশঃ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায় জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়া। জনসাধারণের আনন্দের জন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য চাইতে যাওয়া আপত্তিজনক তো হ'বেই।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়া, এবং যে যেরূপ বইয়ের ভিতরে আনন্দ পাবে তাকে সেইরূপ বই পরিবেশন করা হ'লেও, গৌণত পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠককে নিজের কাছে মূল্যবান করে তোলবার সুযোগ দেওয়া এবং তাকে সমাজের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় করে তোলা। আনন্দ দেওয়ার ছলে যদি জনসাধারণের গ্রন্থাগার এই কাজটুকু করতে পারে তা হ'লেই তার উদ্দেশ্য সফল হ'বে, রাষ্ট্রও তখন বুঝবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে রাষ্ট্রের আর তখন কোন আপত্তি থাকবে না। জনসাধারণও যখন বুঝবে গ্রন্থাগার তাদের কাজে সাহায্য করছে তাদের অভাব দূর করছে, জীবন যাত্রার পথে তাদের সাহায্য করছে, তাদের নৈতিক ও পার্থিব জীবনের সুখের কতকটা অংশ পূর্ণ করছে, তখন তাদেরও আপত্তি থাকবে না তাদের অর্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ পুস্তকাগারের উন্নতির জন্যে সাহায্য করতে।

তাহ'লে আমরা দেখছি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে জনসাধারণ, এবং জনসাধারণেই অর্থ। সুতরাং প্রথম দিকটায় জনসাধারণকেই ভার নিতে হ'বে তাদের পুস্তকাগার গড়ে তোলবার।

গ্রন্থাগারের কর্ম্মী

জনসাধারণের চেষ্টায় আমাদের দেশে যে সব ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সে সব গ্রন্থাগারের কর্ম্মী বল্‌তে একমাত্র গ্রন্থাগারিককেই বোঝায়। তাকে "জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত করতে হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, বেতন বলতে সে কিছুই পায় না। গ্রন্থাগার ঠিকমত পরিচালনার জন্য বিশেষ শিক্ষার যে কিছু প্রয়োজন আছে এ কথা এখনও কেউ মান্‌তে চায় না। এখনও অনেকের ধারণা আছে বই দেওয়া নেওয়া ছাড়া গ্রন্থাগারের আর কোন কাজ নেই। কিন্তু একটু যদি ভেবে দেখেন জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে সুপরিচালিত করতে গেলে কত দূর জ্ঞানের প্রয়োজন তাহ'লে দেখবেন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারের কর্ম্মী হ'তে গেলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বই সাজানো, পুস্তকের তালিকা করা, পুস্তক নির্ব্বাচন, পুস্তক সম্বন্ধে জনসাধারণকে খোঁজ দেওয়া, গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় করে তোলা, এই সব কাজ করবার জন্য বিশেষ উপায় আছে এবং গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের এই সকল উপায় শেখা একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু গ্রন্থাগারিককে বহু প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হ'বে, সে জন্যও তো তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে!

গ্রন্থাগার কমিটি

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, রাষ্ট্র পরিচালিত জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা আমাদের দেশে মাত্র দু' একটী। এবং সম্ভবতঃ এমন কোন একটী

আইনও আজ পর্যান্ত হয় নাই যা'র সাহায্যে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পরিচালনার জন্য আইন করতে পারে, ব্যয়ের বরাদ্দ করতে পারে, এবং সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে পারে এমন একটী কমিটি গড়ে তোলা যায়। আমাদের দেশের আনাচে কানাচে যে সকল চেনা বা অচেনা গ্রন্থাগার আছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নয় সেগুলি দলগত স্বার্থ নিয়ে গড়ে উঠেছে আর না হয় মূলতঃ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠলেও তা ক্রমশঃ একটী দলগত Rendezvous হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই সকল পুস্তকাগারের যে কমিটী নিযুক্ত হয় তার একটা দলগত ব্যক্তিত্ব থাকে। দলগত ব্যক্তি সমষ্টি কখন জনসাধারণের ব্যক্তিত্বকে বুঝতে পারে না, বা বুঝবার উপায় থাকলেও তা বুঝতে চেষ্টা করে না, কারণ দলগত ব্যক্তিত্বের সমুখে রয়েছে দলগত স্বার্থ। এরূপ ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে জনসাধারণের কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

এরূপ ক্ষেত্রে গ্রান্থাগারিকের অবস্থা যে কিরূপ হয় তা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সাধারণের কাছে বিলিয়ে দেওয়া। জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির তার উপরে অধিকার আছে—তাকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আনন্দ দিতে হ'বে; যে যেমন, তাকে তেমন ভাবে আনন্দ দিতে হ'বে। গ্রন্থাগারিক যদি কমিটির হাতের পুতুল-নাচের পুতুল হ'য়ে থাকে তা হ'লে আপনাকে বহুর মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

এখন হয়তো বুঝতে পারছেন গ্রন্থাগারিকের আর গ্রন্থাগার কমিটির মধ্যে সম্বন্ধটা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিচালনার সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিক হ'বে "প্রাণ" আর গ্রন্থাগার কমিটি হ'বে তার "ঠেকনা।" গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন, অর্থাৎ গ্রন্থগারের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগার কমিটিকে চলতে হ'বে। গাড়ীর পিছনে ঘোড়া বাঁধা হ'লেই মুস্কিল, গাড়ি কেবল

পিছুতেই থাকবে সামনে আর এগিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারের অবস্থাও হ'চ্ছে তাই।

গ্রন্থাগার কমিটীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিরা থাকে তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়ই থাকে না। থাকলে অবশ্য ভালো হয় কারণ গ্রন্থাগারিকের সুবিধা হয় তার সমস্যা কমিটিকে বুঝিয়ে দেবার।

কমিটির সাধারণ ভাবে কাজ হ'চ্ছে গ্রন্থাগারের সুপরিচালনার সুব্যবস্থা করা অর্থাৎ গ্রন্থাগার কমিটিকে "ব্যবস্থাপক" সভা বলা চলে। আর গ্রন্থাগারিকের কাজ হ'চ্ছে, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থাগার সুপরিচালিত করা। গ্রন্থাগারিক, ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে, এবং প্রয়োগ করবার পদ্ধতি গ্রন্থাগারিকই নির্দ্ধারণ করবে, এই পদ্ধতির উপর ব্যবস্থাপক সভার হাত দেবার কোন অধিকার নেই—অধিকার নেই বলা চলেনা তবে অধিকার থাকলেও তা সব সময় প্রয়োগ না করা একটা নিয়ম হওয়া উচিৎ। ... ...

শেষ এইটুকুই হয়তো বল্‌লে যথেষ্ট হ'বে যে কমিটির সভ্যদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই জনসাধারণের পার্থিব ও নৈতিক উন্নতি করা এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি অন্যরূপ হয় তা হ'লে সত্যিকারের কাজের লোক গ্রন্থাগারিক হিসাবে পাওয়া গেলেও গ্রন্থাগারের কাজ কিছু হ'বে না—এবং গ্রন্থাগার অকেজো হ'য়েই থাকবে।

গ্রন্থাগারের আয় ব্যয়

আয় থাকলেই ব্যয়ের কথা ওঠে। আয় যেখানে যত বেশী ব্যয়ের সমস্যা সেখানে তত বেশী। আয় যেখানে যত কম ব্যয়ের সমস্যাও সেখানে তত কম। আমাদের দেশে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের আয় বলতে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই, দয়াবান ব্যক্তিদের দান, এবং পাঠকের কাছ থেকে আদায় করা চাঁদার পরিমাণ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, দান গ্রহণ করে আর চাঁদা

আদায় করে গ্রন্থাগার চালানো সম্ভব বলে মনে হয় না, যদিও বা সম্ভব হয় তাতে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সফল হয় না কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠকের রুচি অনুযায়ী "অকেজো" বইয়ের দ্বারাই গ্রন্থাগার ভরে রাখবার প্রয়োজন হয়। পাঠকের রুচি পরিবর্ত্তন করে তার "বই পড়া"কে কাজের করে তোলবার সুযোগ থাকে না।

আমরা আগেই বলেছি রাষ্ট্র জনসাধারণের গ্রন্থাগারের আয়ের একটা বাঁধা বাঁধি উপায় ঠিক করবার মত আইন আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে করেনি। প্রদেশীয় গবর্ণমেন্ট ও পৌরসভা এরা ইচ্ছা করলেই সাধারণ গ্রন্থাগারের আয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু তারা এখনও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন নয় তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তারা সচেতন হ'য়ে উঠবে এবং গ্রন্থাগারের আয়ের ব্যবস্থাও করবে।

গ্রন্থাগারের ব্যয়ের হিসাব নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া যায় :—

বই	১৭%
বই বাঁধাই	৬.৭%
পত্রিকা ও সংবাদ পত্র	৪%
মাহিনা	৪৪%
অন্যান্য খরচা	২০.১%
	১০০

মাহিনা সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি, আমাদের দেশে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কর্ম্মীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিনা বেতনে না হয় নামমাত্র বেতনে কাজ করেন। সুতরাং মাহিনার ৪০% ভাগের অনেকটা বই কেনার জন্য খরচ করতে পারা যায়।

জন সাধারণের গ্রন্থাগারে সংবাদ-পত্র ও পত্রিকা একটী সমস্যা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা যত কম সে গ্রন্থাগারে সংবাদ-পত্র

ও পত্রিকার দরুণ খরচা তত বেশী। এর কারণ হ'চ্ছে গ্রন্থাগারের পরিচালনার অভাব।

একটা কথা ভুললে চলবে না সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রিকার দ্বারা পাঠকের নৈতিক চরিত্রকে স্থায়ীভাবে উন্নতি করা যায় না। সেদিক থেকে মাসিক-পত্রিকা কতকটা কাজের হ'লেও সংবাদ পত্র মোটেই কাজের নয়। খেলার খবর, ঘোড় দৌড়ের টিপস্, চাকরি খালি, সিনেমার সংবাদ, এসব পাঠের দ্বারা জনসাধারণের কতটুকু চাহিদা মেটানো যেতে পারে? দেশ বিদেশ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কি হ'চ্ছে তা জেনে রাখা ভালো, একথা স্বীকার করতে হ'বে, কিন্তু সে সংবাদ রাখা কেবল সংবাদ রাখার খাতিরেই, তা'র আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে তো মনে হয় না।

গ্রন্থাগার গৃহ

গ্রন্থাগারের জন্য নির্ম্মিত গৃহে গ্রন্থাগার, এরূপ আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায়না। অবশ্য গ্রন্থাগারের জন্যই তৈরি করা গৃহ যে আমাদের দেশে একেবারেই নেই একথা বলা চলেনা কিন্তু এরূপ গৃহ যে-কয়েকটী আছে তা গ্রন্থাগারের মত করে নির্ম্মিত হয়নি তার প্রধান কারণ সে সব গৃহ অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের মতামত নিয়ে তৈরী হয়নি।

গ্রন্থাগার গৃহ যখন তৈরী করা হ'বে তখনই তা তৈরী হওয়া উচিৎ কোন অভিজ্ঞ গ্রন্থগারিকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। কারণ গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের জন্য কিরূপ গৃহের প্রয়োজন তা বুঝবে বেশী।

গ্রন্থাগারিক প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগার গৃহের নক্সার কাঠামো করে দেবে, এবং যিনি গৃহ নির্ম্মাণ করবেন অর্থাৎ এন্‌জিনিয়ার তাঁর উপরে অদল বদল করবেন। সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থাগার গৃহের ভিতর কোন স্থানে পুস্তক রাখা হ'বে, কোথায় পাঠ কক্ষ, অফিস গৃহ, পত্রিকা ও সংবাদ-পত্র গৃহ ইত্যাদি হ'বে ঠিক করে নিয়ে পরে বাহিরের দিকের কথা ভাবা উচিৎ।

প্রথম চিন্তা করা প্রয়োজন গ্রন্থাগার সহরের কোন স্থানে হ'বে। একেবারে সহরের বুকে গ্রন্থাগর হ'লে বহু অসুবিধা আছে কারণ এরূপ স্থান কখনও নির্জ্জন হ'তে পারে না। নির্জ্জনতা পাঠের সহায়ক সে কারণে গ্রন্থাগার গৃহ করতে গেলে সম্পূর্ণ নির্জ্জন স্থানে করা প্রয়োজন। স্থান সম্পূর্ণ নির্জ্জন হওয়াতেও অসুবিধা আছে কারণ এমন স্থান সহরের ভিতর পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সহরের বাহিরে যেতে গেলে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা সকলের পক্ষে অসুবিধা জনক হ'য়ে পড়ে কারণ গ্রন্থাগার যে স্থানেই থাকুক না কেন সাধারণতঃ তার প্রভাব এক মাইলের অধিক দূর যায় না।

একটা কথা আমরা বার বার বলেছি যে গ্রন্থাগার, বিশেষ করে জনসাধারণের ও সাধারণ গ্রন্থাগার ক্রমশঃ বড় হ'বে এবং তার পাঠকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়বে সুতরাং গ্রন্থাগার গৃহ এমন ভাবে নির্ম্মিত হওয়া চাই যা'তে গ্রন্থাগার গৃহকে, আসল কাঠামো বজায় রেখে ক্রমশঃ বাড়ানো সম্ভব হয়। গ্রন্থাগার গৃহকে খুব বেশী বাড়াবার প্রয়োজন হ'বে কি না, তার কতকটা আন্দাজ করতে পারা যায়, কি বিষয়ের গ্রন্থাগার হ'বে এবং কারা হ'বে পাঠক গোষ্ঠী তা বিবেচনা করে দেখলে। যেমন ধরুন বিজ্ঞানের গ্রন্থাগারে নতুন বইয়ের সংখ্যাও যেমন বাড়বে তেমনি পুরাতন বইয়ের সংখ্যাও কমবে কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বই শীঘ্র অকেজো হ'য়ে পড়ে এবং সেগুলিকে গ্রন্থাগারে বোঝাই করে রাখার কোন মানে হয়না। ধরুন এমন একটী স্থানে গ্রন্থাগার গৃহ হ'লো যেখানে কেবল কলকারখানার কর্ম্মীদের বই দিতে হ'বে সেখানে হালকি ধরণের বই, এবং কর্ম্মীরা যাতে তাদের ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারে এমনি ধরণের বই তাদের দিতে হ'বে। এরূপ ক্ষেত্রে কয়েকটী বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে এবং কর্ম্মীদের ব্যবসায় সংক্রান্ত যে সব বই যেমন বাড়বে তেমনি কমবে। পাঠকের সংখ্যা মোটামুটি পূর্ব্বে থেকেই নির্ণয় করতে

পারা যায় কারন এক্ষেত্রে পাঠক গোষ্ঠির একটী বিশেষ চরিত্র থাকে তারা কলকারখানার কর্ম্মী।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা কত হ'বে এবং প্রতি বছরে পাঠক সংখ্যা কত বাড়বে তা আন্দাজ করা সম্ভব, এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক সংখ্যার কত বাড়াতে হ'বে তাও কতকটা আন্দাজ করা যায়। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার অন্ততঃ সিকিভাগ বাহিরে বাহিরে ঘুরবে এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন।

জনসাধারণের শতকরা ১২ ভাগ জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সভ্য হ'বে এই হ'লো পাশ্চাত্য দেশীয় গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যার হিসাব। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে এ হিসাব প্রয়োজনীয় নয় কারণ আমাদের দেশে বই পড়বার মত বিদ্যা আছে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম। যেখানে ৪০,০০০ হ'লো লোক সংখ্যা সেখানে মাথা পিছু তিন খানি বই ধরলে পুস্তকাগারে পুস্তক সংখ্যা হয় ১৫,০০০। মঞ্চের হিসাব হচ্ছে এক বর্গফুটে ১৫ খানি বই। পুস্তক মঞ্চের উচ্চতা ৭।৫॥ বেশী না হওয়াই ভালো, তাতে বই বার করার অসুবিধা হয়। মেজে থেকে মঞ্চের প্রথম তাক অন্তত দেড় ফুট উঁচু হওয়া চাই। ১৫,০০০ খানি বই রাখবার জন্যে তাহ'লে ১,০০০ বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন।

আলো বাতাস

পুস্তক এবং পাঠকদের স্বাস্থ্যের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বাতাসের প্রয়োজন। পুস্তকাগারের বই কোন মতেই কাঁচের পাল্লাযুক্ত বা বন্ধ করা আলমারিতে রাখতে নেই তাতে প্রথমত হাওয়ার অভাবে বইয়ের পাতা ভঙ্গুর হয়ে যায়, এবং বই ঝাড়াও অনেক অসুবিধা হয়। উপরন্তু আলমারীর পাল্লা খোলার দরুণ স্থানের অভাব হ'য়ে পড়ে। টানা দরজা দেওয়া আলমারী গ্রন্থাগারের পক্ষে অচল। বইয়ের মঞ্চ খোলা

হওয়া প্রয়োজন, তা'তে বই দেখবার, বই বাহির করবার, বই সাজাবার এবং বই ঝাড়বার অনেক সুবিধা হয়।

আলো যতটা স্বাভাবিক হয় ততই ভালো। সেই কারণে গ্রন্থাগার গৃহের চার পাশে, বা কোন দিকে যদি অন্য কোন ইমারৎ থাকে তা হ'লে, স্বাভাবিক আলো পাবার জন্য অন্ততঃ ৬´ জমি ছেড়ে গ্রন্থাগার গৃহের ভিত উঠবে।

গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্ছে জনসাধারণকে বই পড়তে সুযোগ দেওয়া। নির্জ্জনতাও যেমন পাঠের সহায়ক তেমনি স্বাভাবিক আলোও পাঠের সহায়ক। দিনের বেলা আলো জ্বেলে বই পড়া যতটা এড়াতে পারা যায় ততই ভালো। সেই কারণে পাঠ কক্ষের এবং পুস্তক মঞ্চের গৃহের জানলা যতটা বড় হয় ততই ভালো। জানলা ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত লম্বা হ'বে ছাদের ভার বাহিবার মত যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়াল রেখে বাকি স্থান জানলার দ্বারা সম্পূর্ণ করলেই ভালো হয়। সেই সঙ্গে পাঠ কক্ষের দেওয়ালের ও আসবাব পত্রের রং যতটা হালকি হয় ততই ভালো কারণ তা'তে স্বাভাবিক আলোর প্রতিফলনের দরুণ গৃহ আরোও বেশী আলোকিত হ'বে। স্বাভাবিক আলো পাঠের সহায়ক এবং পুস্তকের স্বাস্থ ভালো রাখে সত্যি কিন্তু চোখে লাগে এমন আলো চক্ষুর পীড়াদায়ক এবং পুস্তকের উপর সোজাসুজিভাবে আলো পড়লে পুস্তকের বাঁধাইয়ের রং খারাপ হ'য়ে যায়। সেই কারণে পুস্তকের মঞ্চ সাজানো প্রয়োজন জানলাকে মাঝে রেখে এবং ঠিক ঐ-একই ভাবে পাঠ-গৃহের টেবিল সাজানো প্রয়োজন।

পাঠ গৃহের ছাদের উপরে কাঁচের দ্বারা আবরিত খোলা স্থানের দ্বারা পাঠগৃহকে কতকটা আলোকিত করা সম্ভব কিন্তু তা'তে অসুবিধা আছে ঝড় বৃষ্টির সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সব আলোক পথ অকেজো হ'য়ে পড়ে এবং ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল এসে পড়ে।

শিলাবৃষ্টি হ'লে সমস্ত কাঁচ ভেঙ্গে যাওয়া সম্ভব, সে কারণে প্রায় প্রতি বছরেই কাঁচ বদলাবার প্রয়োজন হয়।

যেখানে স্বাভাবিক আলো পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে বিজলী আলোর দ্বারা গৃহ আলোকিত করতে হ'বে। সে ক্ষেত্রে কেবল লক্ষ্য রাখতে হ'বে, আলো যেন চক্ষুর পীড়াদায়ক না হয়। আলোর উৎপত্তিস্থল পাঠকের চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকলে ভালো হয়।

গ্রন্থাগার গৃহের আসবাবপত্র

পুস্তক মঞ্চ ঃ পুস্তকাগারের কাঠের পুস্তক-মঞ্চেরই এতদিন চলন ছিল। ইস্পাত ক্রমশঃ কাঠের স্থান অধিকার করছে। মঞ্চ করবার সময় সাধারণতঃ দুটী প্রশ্ন ওঠে। প্রথমতঃ স্থান সঙ্কুলান এবং দ্বিতীয়ত খরচা। কাঠের মঞ্চ করতে গেলে মঞ্চ-গৃহের অনেকটার স্থান, মঞ্চের স্থান সঙ্কুলানের জন্য নষ্ট হয় কারণ, মঞ্চকে যথেষ্ট পরিমাণে মজবুত করে করতে গেলে অনেকটা পুরু কাঠের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইস্পাতের মঞ্চে বেশী স্থান লাগে না উপরন্তু কাঠের মঞ্চ অপেক্ষা ইস্পাতের মঞ্চের খরচাও অনেক কম হয়। অনেকে বলেন কাঠের উপর ইচ্ছামত রং করা সম্ভব সে কারণে কাঠের মঞ্চ গৃহের শোভা বাড়ায় কিন্তু আজকাল ইস্পাতের উপরেও ইচ্ছামত রং করা চলে এমন কি রং-এর দ্বারা ইস্পাতকেও কাঠের রূপ দেওয়া যায়।

মঞ্চগৃহে একটী বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন ঃ যাতায়াতের জন্য এবং বই বাহির করবার জন্য দু'টী মঞ্চ সারির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পথ থাকা চাই। পাঠকের যেখানে মঞ্চের মধ্য প্রবেশাধিকার আছে সেখানে দুই মঞ্চ সারির মধ্য অন্ততঃ তিনি ফুট পথ থাকা চাই এবং যেখানে মঞ্চে পাঠকের প্রবেশাধিকার নাই সেখানে দুই ফুট পথই যথেষ্ট। মঞ্চের চলতি মাপ হ'চ্ছে ৭'৬" × ৩"।

পুস্তক তালিকার দেরাজ ঃ পুস্তকের তালিকা আজকাল ৫" × ৩"

মাপের কার্ডের উপর রাখা হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ তালিকার প্রচলন হ'চ্ছে। দেরাজে তালিকা রাখার একটা অসুবিধা হ'চ্ছে, একজন যখন তালিকা দেখে, তখন সেই ব্যক্তির দ্বারা দেরাজের কয়েকটী সার আবরিত হ'য়ে থাকে এবং যতক্ষণ না একজনের তালিকা দেখা হ'চ্ছে ততক্ষণ আর একজনকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়। দুইদিকে টানা যুক্ত দেরাজ এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করে। দুই দিকে টানা দেওয়া দেরাজের নিম্নে একটী নমুনা দেওয়া হ'লো :—



উপরি-উক্ত কার্ড দেরাজের দ্বারা উল্লিখিত সমস্যা কতকটা সমাধান করা যেতে পারে। আর একটী উপায় হ'চ্ছে ছোট ছোট দেরাজ তৈরী করে একস্থানে না রেখে বিভিন্ন স্থানে রাখা। কাঠের দেরাজের স্থলে আজ-কাল ইস্পাতের দেরাজের ও ব্যবহার হ'চ্ছে কিন্তু ইস্পাতের দেরাজের অসুবিধা আছে টানা গুলি টানিবার সময় ও প্রবেশ করাইবার সময় যে শব্দ হয় তা'তে পাঠকক্ষের নিস্তব্ধতা নষ্ট হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বই চুরি ও বইয়ের অঙ্গহানি

চুরি অনেকে করে এবং চুরি বহুলোকে করে না। কিন্তু চুরি কেন করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই, চুরি করা বন্ধ করতে পারা যায়।

চুরি যে করে তার মনের কথা হ'চ্ছে "যদি জিনিষটা তুমি আমায় না দাও তাহ'লে আমি জিনিষটা চুরি করবো।" মূলত চুরি করার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে নিজেকে বড় মনে করা ও নিজেকে বড় করার চেষ্টা। যে চুরি করে সে মনে করে "অমুক জিনিষটা যখন আমায় দেওয়া হয়নি ; ভালোভাবে জিনিষটা চাওয়া সত্ত্বেও যখন তা আমায় দেওয়া হয়নি—তখন আমার চুরি করবার অধিকার আছে"—নিজেকে সে এইরূপে ভুল বুঝিয়ে চুরি করে। চুরি করবার পর আরম্ভ হয় বিবেকের তাড়না ; তখন তার মনে হয় চুরি করে সে "পাপ" করেছে। তখন সে "পাপ করেছে" এই ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। চুরি করাটা যে "পাপ কাজ" নয় এইটে নিজেকে বোঝাবার জন্যে সে আরো বেশী চুরি করতে থাকে। ক্রমশঃ চুরি করাটা তার অভ্যাসগত হ'য়ে যায়। বার বার চুরি করে সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে "দেখছ তো—আমি চুরি করছি কিন্তু শাস্তি পাচ্ছি না—তাহ'লে চুরি করলেই যে শাস্তি পেতে হ'বে এমন কথা তো কিছু নেই—তাহ'লে চুরি করাটা যে পাপ এ কথাটা মিছে কথা।"

চুরি করা অভ্যাসের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা হ'চ্ছে, শিশু যখন জন্মায় তখন সে জানে কেবল নিজেকে—সে জানে, তাকে সব দিতে হ'বে, কোন আইন সে মানতে চায় না। অর্থাৎ তার ভিতরে যে মানুষটী

রয়েছে সে মানুষটী সামাজিকতা বলে কিছু জানে না। কিন্তু ক্রমশঃ যত সে বড় হ'তে থাকে, তার আশপাশের লোককে দেখে, সে ক্রমশঃ তাদের মত করে নিজেকে গড়তে থাকে ফলে তার স্বাভাবিক মানুষটীর উপর আর একটী মানুষ গড়ে উঠতে থাকে—এ মানুষটী হ'লো সামাজিক মানুষ। স্বাভাবিক মানুষটী জানতো না—"চুরি করা বড় দোষ"—চুরি করলে শাস্তি পেতে হয়। সামাজিক মানুষটি কিন্তু তা জানে। সামাজিক মানুষটীর চাপে স্বাভাবিক মানুষটি সুপ্ত থাকে ও সুবিধা পেলে সে জেগে ওঠে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে মানুষকে বারবার তাগিদ দিতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক মানুষটী হার মানে এবং স্বাভাবিক মানুষটীর হয় জিৎ ফলে মানুষ যে কোন উপায়ে পারে প্রয়োজন মেটায়; চুরি করা অস্বাভাবিক হ'লেও সে চুরি করে। কিন্তু চুরি করেই সে পার পায় না—সামাজিক মানুষটি তা'কে বলতে থাকে "তুমি চুরি করেছ, চুরি করলে শাস্তি পেতে হয়, তোমায় শাস্তি পেতে হবে, তোমায় শাস্তি পেতে হবে"—ফলে যে চুরি করেছে সে শাস্তি পাবার আশায় বসে থাকে। কিন্তু ধরুন সে শাস্তি পেলো না। তখন তার মনে সংশয় আরো বেড়ে যায় কারণ সে জেনেছে শাস্তি তাকে পেতেই হ'বে; শাস্তি না পেলে তার পাপের স্খালন হ'বে না। এইভাবে বিবেক তাকে অনবরত পীড়ণ করতে থাকে, ফলে শাস্তি পাবার জন্যে সে আবার চুরি করে এবং ক্রমে চুরি করাটা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

আজকালকার যুগে, নিজের সকল প্রয়োজন মেটানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয় যদিও তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু তাদের চোখের সামনেই থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বস্তু চোখের সামনে থাকলেও তা চুরি করা তো সমাজ কখন মেনে নেবে না। বহু লোক তো চুরি করে না—কেন? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুরি না করার কারণ হ'চ্ছে সামাজিক রীতিনীতির শক্তি এবং শাস্তি পাবার ভয়। কিন্তু এমনও ব্যক্তি আছে যারা সামাজিক নিয়ম

মেনে চলতে রাজী নয় এবং তারা শাস্তির ভয় করে না। "চুরি করা বড় দোষ" সেই কারণে যে অনেকে চুরি করে না, এ ধারণা একেবারে ভুল। অনেকে চুরি করে না কারণ তারা সমাজের মধ্যে বাস করে, ক্রমশঃ সামাজিক বাস্তবতার সাহায্যে নিজের মধ্যে একটা শক্তি জাগিয়ে তুলতে পেরেছে, যে শক্তির বলে তারা নিজেকে বোঝাতে পারে প্রয়োজন হ'লেই তা মেটাবার দরকার হয় না। সুতরাং প্রয়োজন যতই থাকুক না কেন, প্রয়োজন মেটাবার জন্যে চুরি করা, এ তারা মেনে নিতে পারে না।

নিজের উপরে উঁচু ধারণা এবং সেই ধারণা বজায় রাখবার জন্য জীবন যাত্রার যুদ্ধ করবার শক্তি নির্ভর করে ব্যক্তিগত "আদর্শে"র উপর। ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত আদর্শকে গড়ে তোলে, নিজেকে অন্যের সঙ্গে এক করে দেখে সামাজিক শিক্ষার দ্বারা। এবং সেই কারণে "আমার" অস্তিত্ব থাকে না যদি "অন্য" না থাকে। সামাজিক আদর্শের দ্বারা "অন্য" যেমনভাবে গড়ে উঠবে "আমিও" ঠিক তেমনি ভাবে গড়ে উঠবে সুতরাং "ব্যক্তি"র গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে সমাজের শিক্ষা এবং সমাজের "ব্যক্তিত্ব"।

সমাজের ব্যক্তিত্ব দু'রকমের : প্রভুত্বব্যাঞ্জক ও প্রজাতান্ত্রিক। প্রভুত্ব ব্যাঞ্জক সমাজ তার প্রভুত্বের ঢাক বাজিয়ে সমাজভুক্ত ব্যক্তিকে পালন করবার চেষ্টা করে। এরূপ সমাজ সোজাসুজিভাবে বলতে চায় : "তুমি আমায় মেনে চল (আমার অধীন হ'য়ে থাক) তবে আমার ক্ষমতার উপর তুমি অধিকার পাবে এবং তবেই আমি তোমায় রক্ষা করবো"। কিন্তু এরূপ গায়ের জোরে শাসন করলে মানুষের স্বভাব পরিবর্ত্তন হওয়া তো দূরের কথা, তা'তে ব্যক্তির আত্মাভিমানে ঘা লাগে এবং তার আদর্শের উন্নতি সাধন হয় না। তা'তে চুরি করার প্রেরণা আরো বেশী বেড়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে তার প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর তার অধিকার আছে, সকলেরই অধিকার আছে তা হ'লে চুরি করার জেদ তার আর বেড়ে ওঠে না। শিশু জানে তার

প্রয়োজনীয় বস্তু পেতে হ'লে তা'কে বাপ মায়ের কথা মেনে চ'লতে হ'বে কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার সে শিখছে নিজের প্রয়োজন মেটাতে গেলে তা'কে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'বে।' আগেকার দিনে প্রভুত্বব্যাঞ্জক সমাজ মানুষকে নিজের আয়ত্ত্বে এনে নিজের মত করে তাকে গড়ে নিতে পারতো তার কারণ জীবনযাত্রায় তখন প্রতিযোগিতা ছিলনা--এবং তখন মানুষ সহজেই বুঝত সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে এরূপ অধীনতার প্রয়োজন। কিন্তু জীবন যাত্রার "নিজের পায়ে দাঁড়াবার" প্রয়োজন ক্রমশঃ যখন সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো তখন মানুষ আর অধীনতা স্বীকার করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে রাজী হ'লো না। প্রতিযোগিতায় জেতবার জন্যে তাকে সকল রকম উপায়ই অবলম্বন করতে হ'লো।

গ্রন্থাগারকে যদি একটী বিশিষ্ট সমাজ বলে ধরে নেন এবং পাঠকরা যদি সেই সমাজভুক্ত ব্যক্তি হয় তা হ'লে আমাদের স্বীকার করতেই হ'বে যে পুস্তকাগারের প্রভুত্বের ঢাক পাঠকের কানের কাছে কিছুতেই বাজানো উচিৎ নয়। পাঠক যদি বোঝে, গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের উপর তার অধিকার আছে, প্রয়োজনীয় বস্তু যদি থাকে তা হ'লে সে নিশ্চয় পাবে, তা হ'লে সে কেন চুরি করতে যাবে? কিন্তু আমাদের দেশের পুস্তকাগারে প্রবেশ করবার প্রথমে পুস্তকাগারের প্রভুত্ব যেন আমাদের অস্বস্তিকর মনে হয়, পুস্তকাগারে পুস্তক সম্ভার যে আমাদের প্রয়োজনেই আছে এ কথা যেন আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। মোট কথা আমাদের দেশের পুস্তকাগারের আবহাওয়াটা যেন মোটেই সুখ-কর বলে মনে হয় না ফলে আমাদের যে প্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হ'য়ে সমাজের প্রয়োজনীয় অন্য আকারে প্রকাশ পেতে পারতো তা পরিমার্জ্জিত না হ'য়ে আরও উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। পুস্তকাগার সমাজের আবহাওয়া এমন চাই, যা'তে পাঠকের মনের মধ্যে এক বিশিষ্ট বিবেককে জাগিয়ে তোলে, পাঠকের মনের মধ্যে একটা বিশেষ মানসিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলে

যে শক্তি "প্রয়োজন মেটাবার জন্যে চুরি করতে হয়" এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কেবল গ্রন্থাগারের মধ্যে কেন সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই এ রকম আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারা যায়।

গ্রন্থাগারের ভিতরে এরূপ প্রীতিকর আবহাওয়ার প্রথম উপায় হ'চ্ছে গ্রন্থগারের পুস্তক সম্ভারের উপর পাঠকের সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হ'বে। পাঠকের কাছে পুস্তক-মঞ্চ খুলে দিতে হ'বে। পাঠককে নিজের চোখে দেখতে দিতে হ'বে তার প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রন্থাগারে আছে কিনা। পাঠককে নিজে বই বার করে আনার সুযোগ দিতে হ'বে—কর্ম্মচারিদের মধ্যে বই বার করার ভার দিলে চলবে না কারণ কর্ম্মীদের উপর পাঠকের বিশ্বাস নেই। রুদ্ধ—মঞ্চ গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের উপর পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না।

গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথেই বই দেবার ব্যবস্থা করুন। তাতে পাঠকের উপর নজর রাখবার সুবিধা হ'বে কিন্তু পাঠক যেন মনে না করে তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হ'চ্ছে। "চুরি করা বড় দোষ" "বইয়ের পাতা চুরি করা পাপ কাজ" এসব কথা প্রভুত্বব্যঞ্জক সুতরাং গ্রন্থাগারময় এসব কথা লিখে রাখা কোন কাজের নয়।

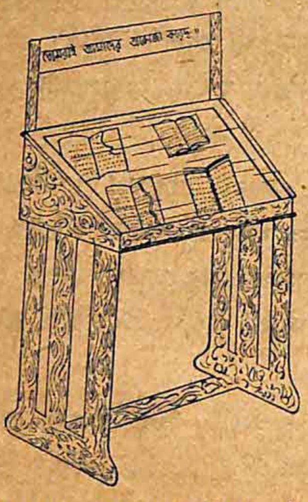
চুরি করা স্বভাব যত পুরাতন বা নতুন হ'ক না কেন তা'র পরিমার্জ্জন সম্ভব, কারণ আমাদের মনে রাখতে হ'বে মানুষের আদিম চরিত্রের যে পরিমার্জ্জন হ'য়েছে তা সামাজিক উন্নত আবহাওয়ার ফলেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হ'বে যে আদিম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হ'বার সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ পাবে।

চুরি ধরা পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কিন্তু আমরা দেখছি চুরির শাস্তি দিলে চুরিটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। একমাত্র উপায় হ'চ্ছে এক্ষেত্রে যে চুরি করেছে তাকে আর গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে না

দেওয়া কিন্তু তা'তে গ্রন্থাগার একজন পাঠক হারায়। সুতরাং শাস্তির পরিমাণটা যতটা সম্ভব লঘু করে তাকে আবার গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেওয়া ভালো এবং গ্রন্থাগারিকের এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য হ'চ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে কথা কওয়া, এবং তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে গ্রন্থাগার সকলের জন্যে সেখানে আত্মপ্রসাদের খাতিরে সকলের ক্ষতি করা উচিৎ নয়। মানুষের স্বাভাবিক মনটিও (যা'কে আমরা স্বাভাবিক মানুষ বলেছি) আত্ম মুখী, সুতরাং প্রথমক্ষেত্রে চুরি করার মূলে পরোক্ষভাবে রয়েছে "আত্ম-প্রসাদ"— সুতরাং শাস্তির ব্যবস্থা এক্ষেত্রেও ঐ একই রকম হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারে বই চুরি এবং বই বইয়ের অঙ্গহানি বন্ধ করবার জন্যে আর একটী ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং মনে হয় তা'তে কাজ হ'বে খুব ভালো।

উপরের ছবির মত কাঁচের আবরণযুক্ত একটী বুককেস তৈরী করে, সেটিকে গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথের কাছাকাছি এমন একটী স্থানে রাখুন যা'তে পাঠকদের যেতে আসতে বুক কেসটী নজরে পড়ে। সেই বুক-কেসের ভিতর পাতা-কাটা বইগুলি খুলে এমনভাবে রাখুন যা'তে সকলেই দেখতে পায় বইগুলির পাতা কাটা হ'য়েছে। মোটা বোর্ডের উপর সুস্পষ্ট অক্ষরে—"তোমরাই আমাদের অকেজো করেছ"—"আমাদের অঙ্গ-হানি করে নিজের ক্ষতি করেছ— সে জন্যে তোমরা দায়ী"—এই রূপ কয়েকটী বাক্য ছেপে রাখুন। সপ্তাহে



একবার করে বুককেসের উপর এক একটী এইরূপ বাক্য পরিবর্ত্তন করে দিতে থাকুন।

এর ফল যে কি দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায় সুতরাং ব্যাখ্যা দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যে সত্যিই দোষী তাকে নিজের কাছে দোষী সাব্যস্ত করবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। এইটেই হ'বে তার সব চেয়ে বড় শাস্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থাগার নীতি

মানব-সভ্যতার পিছন দিকে ক্রমশঃ পিছিয়ে গেলে দেখা যায় নীতির কড়াকড়ি ক্রমশঃ কমে আসছে। মানুষ যত বেশী সভ্য হচ্ছে, নীতির কড়াকড়ি ততই বেশী হচ্ছে এবং এ কথা বললে হয়তো অন্যায় হবে না। মানুষের সভ্যতার মান নির্ভর করে নীতির কড়াকড়ির মানের উপর। কিন্তু মানুষ বেচারির চলে, ফিরে, খেয়ে, পরে, সুখ নেই। এই নীতির ভয়ে সব সময়েই তাকে চিন্তা করতে হয়, তার কোন কাজ নীতিবিরুদ্ধ হচ্ছে কিনা। তবু নীতিশাস্ত্র চাই; কারণ মানুষ যে একলা একলা থাকতে পারে না। তাঁকে যে সমাজের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হয়। সুতরাং তার জীবনটা যখন সমাজকে নিয়েই তখন তাকে মানতেই হবে সমাজের আইন, নিজের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে সমাজের নমুনা অনুযায়ী, অসম্ভবকেও সম্ভব করতে হবে। সকলকেই হতে হবে এক ছাঁচে ঢালা।

আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, সেগুলির মধ্যে ভালোও আছে মন্দও আছে। নীতিশাস্ত্রের কাজ হচ্ছে মন্দগুলিকে দমিয়ে রাখা শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে নিয়ে এসে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে ভালো বা মন্দ বলে সত্যিই কিছু আছে কি? মনে হয় না। মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই তার প্রয়োজন পরিপূরণ করবার জন্যে—মূলতঃ এগুলি সকলের মধ্যেই সমান। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে ভালো আর মন্দের দাগ আমরাই দিয়েছি কারণ তাদের মধ্যে কতকগুলি সমাজের কাজে লাগে না, এবং কতকগুলি সমাজের

কাজ করে। আমরা সাধারণতঃ মন্দ বলে দেগে দিই আমাদের অন্তর্নিহিত সেই সব স্বাভাবিক প্রেরণাকে যেগুলিকে আদিম পর্য্যায়ে ফেলা যায়, যেমন ঃ হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি।

মানুষের আদিম গুণগুলির ক্রমবিকাশ হচ্ছে এবং এই ক্রমবিকাশের ফলেই, সেই গুণগুলির আদিমতা পরিমার্জ্জিত হয়ে অন্যরূপে প্রকাশ পায়। স্বাভাবিক প্রেরণার লক্ষ্যবস্তু পরিবর্ত্তিত হয়। এমনিভাবে হিংসা থেকে আসে করুণা, আত্মানুরাগ থেকে আসে পরসেবা।

সুতরাং আমরা দেখছি সমাজের মধ্যে থাকতে গেলে মানুষকে সামাজিক হ'য়ে থাকতে হবে, তার চরিত্রকে সমাজের প্রয়োজনীয় করে গড়ে তুলতে হ'বে। গ্রন্থাগারে কাজ করতে গেলে সব চেয়ে বেশী সামাজিক হওয়া দরকার। কারণ সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে এখানে ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়—বিশেষ করে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগার যেন বিশ্বেশ্বরের মন্দির, এখানে বড় ছোটর বাচ-বিচার নেই, এখানে ধনী-গরীবের পার্থক্য নেই, এখানে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর বিভেদ নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলা, সমাজের কাছে প্রয়োজনীয় করে তোলা।

গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের কত রকমের প্রশ্নের সম্মুখীন যে হতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাদের, রাগ করলে চলবে না, বিরক্ত হলে চলবে না, ধৈর্য্য হারালে চলবে না। তাদের মনে রাখতে হবে তারা সমাজের কাজে নেমেছে—সমাজের নৈতিক উন্নতির গুরুভার তারা নিয়েছে। তাদের কাজের ও যোগ্যতার পরিমাণ টাকার মানে বিচার করে দেখলে চলবে না। তাদের যোগ্যতার বিচার করে দেখতে হবে কতটা কাজ তারা করছে তার পরিমাণের উপর।

যদি কেউ মনে করে থাকেন গ্রন্থাগারে কাজ করে বড়লোক হ'বেন, সাধারণের কাছে নাম কিনবেন, তা হ'লে তাঁকে গোড়াতেই জানিয়ে

দেওয়া প্রয়োজন—এ পথে সুবিধা হবে না; কারণ এখানে আছে পরিশ্রমের পরিবর্তে দারিদ্র্য, এখানে আছে সুনামের পরিবর্তে কুনাম।

যে কোন একটী পেশার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—সেই পেশার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ও জনসাধারণের উন্নতি করা। এবং এই উদ্দেশ্য যা'তে যথাযথ-সম্পন্ন হয়, সে জন্য কতগুলি নিয়মের প্রয়োজন। এই নিয়মগুলি মেনে চলার উপর নির্ভর করে পেশার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও গুণাগুণ—এই সকল নিয়ম মেনে চলতে গেলে নিজের স্বাধীনতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ করতে হয়—কিন্তু উপায় নেই তা না হ'লে ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে।

গ্রন্থাগারিক সব সময়েই গ্রন্থাগার কমিটির অধীন কিন্তু তা'তে গ্রন্থাগারিকের ক্ষুণ্ণ হ'বার কিছু নেই। কিন্তু এটুকু অস্বীকার করলে চলবে না যে কমিটি-ভুক্ত ব্যক্তিগণের চেয়ে গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান অনেক বেশী—তার কারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন যতটা বেশী গ্রন্থাগারিক জানবে ততটা আর কারো জানা সম্ভব নয়। সে কারণে কমিটির দিক থেকে গ্রন্থাগারিকের দাবী বারবার অগ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। গ্রন্থাগারের উন্নতির ভার সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করছে; তার কারণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, তাদের প্রয়োজন, কিরূপে তাদের প্রয়োজন মেটানো যায়, সমাজের মনের গতি কোন দিকে চলছে, কোন দিকে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার, এইসব বিষয় সুচতুর গ্রন্থাগারিক যতটা জানবে ততটা আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

কোন বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগারে বিশেষজ্ঞের অভাব নেই, কিন্তু সেই সব বিশেষজ্ঞেরা যেন মনে না করেন পুস্তক সংকলন ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতের উপর কিছু বলবার নেই। হ'তে পারেন তাঁরা বিশেষজ্ঞ কিন্তু তাঁদের একথা মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগারিক অল্পবিস্তর সব বিষয় সম্বন্ধেই সংবাদ রাখে এবং সংবাদ রাখবার সুযোগ গ্রন্থাগারিকের যত বেশী তত বেশী বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নেই। শিক্ষাকেন্দ্রের গ্রন্থাগারে বিশেষজ্ঞদের মতামতের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে তা অবশ্য স্বীকার করতে হ'বে কিন্তু সাধারণের গ্রন্থাগারে

পুস্তক সংকলন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামতের মূল্য অতি নগণ্য ; কারণ সাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠকের যা পড়া উচিৎ তা ভরে রাখলে চলবে না। সাধারণের গ্রন্থাগারে এমন বই রাখতে হ'বে যা পাঠক পড়তে চায়। যদিও শিক্ষার ভিত্তিতেই পুস্তকাগার গড়ে উঠেছে কিন্তু গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে—জনসাধারণকে পার্থিব ও নৈতিক আনন্দ দেওয়া। সুতরাং উদ্দেশ্য যদি হয় আনন্দ দেওয়া তা হলে বিশেষজ্ঞের মতামতের দাম বড় একটা থাকে না কারণ বিশেষজ্ঞের মতে একখানি বই ভাল হ'লেও জনসাধারণের পক্ষে তা অখাদ্য হ'তে পারে। সেই জন্যে কোন বিশেষ গ্রন্থাগারের উন্নতির দিক থেকে গ্রন্থাগারিকের মতামত খুব বেশী প্রয়োজন না হ'লেও, সাধারণের গ্রন্থাগারের দিক থেকে গ্রন্থাগারিকের মতামত অতি প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগারিক কমিটির সকলের সহিত সমান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখবার চেষ্টা করবেন—নিজের যেন কোন সভ্যের সহিত মন-মালিন্য বা অতিরিক্ত আত্মীয়তা না থাকে। কোন সভ্যের নিকট খাতির পাবার আশায় তার খোসামোদ করার প্রয়োজন নেই—সকলের সহিত সমান ব্যবহার করা দরকার। ব্যবহারের ফলে যেন কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা দাঁড়িয়ে না যায়।

"চেয়ারের গুণই এই"—একথাটা আজকাল ভীষণ চলতি হ'য়ে গেছে—অনেক গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারিকের পদে বসে মনে করেন "বড় হ'য়েছি"। বড় হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এটা মানুষের জন্মগত প্রেরণা। মানুষের সভ্যতার মূলেও এই বড় হওয়ার আকাঙ্খা। সুতরাং তা কিছু অন্যায় নয় ; কিন্তু এই বড় হওয়ার ধারণাটা যখন কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়ে অপরের উপর চেপে বসতে থাকে এবং নিচেয় যাঁরা রয়েছেন বড়র কাছে যখন নিজেকে ছোট বলে মনে করতে থাকেন তখন বড় আর ছোটর মধ্যে সম্বন্ধটা গতানুগতিক হ'য়ে দাঁড়ায়। সে অবস্থায় ছোটর কাছ থেকে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের ফাঁকির নেশাটা বেশী বেড়ে যেতে থাকে। গ্রন্থাগারিকের পেশা এবং যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করেন

তাঁদের পেশা সমান—দুজনের পেশার উদ্দেশ্য এক, সুতরাং সকলেরই কাজ, এক, সকলেই সকলের বন্ধু। গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে অন্যান্য কর্ম্মীদের সম্বন্ধটা বন্ধুত্বের হওয়া প্রয়োজন। কোন কর্ম্মী অন্যায় করলে নিজের ঘরে তাকে ডেকে এনে, বৃথা কতগুলো রূঢ় কথা না বলে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার কোথায় সে অন্যায় করেছে। নিজের পদের মর্য্যাদাটা গলার জোরে সকলের কাছে প্রচার করা উচিৎ নয়। গ্রন্থাগারের বাইরে গ্রন্থাগারের ভিতরের কোন কথা যেন প্রকাশ না পায়। গ্রন্থাগারিকের কোন কর্ম্মীকে কিছু বলবার থাকলে কখনই তা কারো সামনে বলা উচিৎ নয়।

তেমনি গ্রন্থাগারিক যদি কোন ভুল করে থাকেন, কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে তা গ্রন্থাগারিককে জানানো। গ্রন্থাগারিকের সব সময় কর্ত্তব্য হ'চ্ছে তা খোলা মনে বিচার করে দেখা। অপরের কাজের মধ্যে গলদ খুঁজে বেড়ানো বা অপরের নিন্দা করাটা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়—এরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সকলকে নিজের মত করে দেখবার চেষ্টা করা, তাতে নিজের চেতনার দংশনের জ্বালা কতকটা উপশম হয়।

গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের, সকল পাঠকের সহিত সমান ব্যবহার করা দরকার—বন্ধুত্বের খাতিরে কোন পাঠকের উপর বেশী সদয় হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই—তাতে কর্ম্মীকে শেষ পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্থ হতে হয়।

গ্রন্থাগারিক রাজনীতি সম্বন্ধে সকল সংবাদই রাখবেন পাঠকদের অবগতির জন্যে—কিন্তু নিজে রাজনীতি করা কোন ক্রমেই উচিৎ নয়। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না জনসাধারণের গ্রন্থাগার জনসাধারণেরই, কোন দলগত উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে নয়। কোন গ্রন্থাগার কোন দলগত স্বার্থ বজায় করছে, এ ধারণা একবার জনসাধারণের মনে জাগলে গ্রন্থাগারের সুনামের উপর কালি পড়তে থাকবে।

গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধীয় যা কিছু ব্যাপার গ্রন্থাগারের সকল কর্ম্মীদের জানা প্রয়োজন। এ সব বিষয় সকলের কাছে গোপন রাখা উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-

চারীদের একটা স্বভাব। তা'তে তাঁরা আত্মপ্রসাদ পান। নিম্নপদস্ত কর্ম্মচারীদের উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে অনেক কথা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা গোপন রাখবার চেষ্টা করেন কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা গোপন করবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। উপরন্ত তা'তে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা উচ্চপদস্থদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, তা'তে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধটা ক্রমশঃ বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে।

বড় বড় গ্রন্থাগারে আসবাবপত্রের জন্য, বই কেনার জন্য এবং আরো অনেক ছোটোখাটো প্রয়োজন বাবদ বহু টাকা ব্যয় হ'য়ে থাকে। ব্যবসাদারেরা গ্রন্থাগারিককে না হয় তাদের বন্ধুবান্ধবকে, না হয় গ্রন্থাগারিকের কোন প্রিয় কর্মীকে হাত করবার চেষ্টা করে। ব্যবসাদারের দিক থেকে সেটা নীতিবিরুদ্ধ নয় কিন্তু এরূপভাবে প্রলুব্ধ হওয়া গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বা গ্রন্থাগারের কর্মীদের পক্ষে সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ।

এদেশের লোকেরা এখনও গ্রন্থাগারমনা হয়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন যে কতদূর তা এখনও সাধারণের কাছে প্রকটভাবে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু গ্রন্থাগারের সে অবস্থা এখন আর সুদূরপরাহত নয়। গ্রন্থাগারের সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদা বাড়বে। সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারিক তখন আর নগণ্য ব্যক্তি হ'য়ে থকেবেন না। তখন কিন্তু গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের ভিতরে নীতি বজায় রেখে কাজ করলেই চলবে না। গ্রন্থাগারের বাইরেও তাঁকে ভেবে চিন্তে চলতে হ'বে। সামাজিক নৈতিকতার খেলাপ হয় এমন কোন কায করাই তাঁর চলবে না।

আমরা আগেই বলেছি গ্রন্থাগারে যোগ্যতার পরিমাণ টাকার পরিমাপে হয় না—যোগ্যতার পরিমাপ হয় কাজের পরিমাপে। একটু কাজ শিখলেই গ্রন্থাগারের কর্মীরা অল্প লাভের আশায় অন্য স্থানে কাজ নেবার চেষ্টা করে। গ্রন্থাগারের কোন কর্মীর পক্ষেই তা করা উচিত না। সে

যা অর্জ্জন করছিল তা অপেক্ষা হয়তো কিছু বেশী উপার্জ্জন করবে কিন্তু কাজের সুযোগ কতটা পাবে তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকেরও অতি সাবধানে প্রশংসা-পত্র দেওয়া প্রয়োজন। আইনের দিক থেকে দেখতে গেলে এবং মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে বলতে হয় প্রশংসা-পত্র দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। প্রথমতঃ কাজ পাওয়া না পাওয়াটা নির্ভর করছে কর্ম্মপ্রার্থীর কর্ম্মকুশলতার উপর এবং দ্বিতীয়তঃ প্রশংসা-পত্রের ভালো মন্দ নির্ভর করবে যিনি দিচ্ছেন আর যিনি নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সম্বন্ধের উপর। সুতরাং প্রশংসা-পত্রকে কখনও প্রশংশিত ব্যক্তির কর্ম্ম-কুশলতার ভিত্তি বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। তারপর যিনি প্রশংসা পত্র দিচ্ছেন, তিনি প্রশংসিত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাবে কতটুকু জানেন? প্রশংসা-পত্র দেবার আগে এটুকুও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন।

যিনি গ্রন্থাগারিক তাঁর অধীনস্থ সকল প্রকার কর্ম্মচারীকে সমানভাবে দেখা উচিত। কেউ বেশী দিন কাজ করছে, বা কেউ বেশী মাইনে পাচ্ছে বলে তাদের ভালো নজরে দেখা আর যা'রা নতুন এসেছে বা যা'রা কম মাইনে পায় তাদের উপর কম নজর দেওয়া কোনক্রমেই গ্রন্থাগারিকের উচিত নয়। মাইনে যাই হ'ক না কেন, গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের মধ্যে স্থান যাই হ'ক না কোন, তোমায় দশগুণ মাইনে দিলে যা কাজ করতে, সেই কাজই তোমায় করতে হ'বে।

নূতন যা'রা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করেছেন তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মীদের কাজের দোষ গুণ বিচার করা উচিত নয় এবং তাদের দোষ গুণ নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা উচিত নয়—এরূপ স্বভাব অনেক কর্ম্মীই পছন্দ করে না, কারণ তারা পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীর সঙ্গে—এমনও হ'তে পারে—আনন্দের সহিত কাজ করে এসেছে এবং তাদের কখনও কোন দোষ দেখতে পায়নি। এরূপ ক্ষেত্রে নতুন কর্ম্মচারীর উপর তাদের একটা বিতৃষ্ণা জন্মে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার এতদিন যেরূপে চলে আসছে—তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিদর্শন অনুযায়ী নয় এবং গ্রন্থাগারের কোন কাজই বিজ্ঞান-সম্মত নয়। কাজ চলে আসছে ঠিকই, একথা অস্বীকার করা চলে না—কিন্তু সে কাজ যে বিজ্ঞান-সম্মত হ'লে আরো ভালো ভাবে চলবে না এ কথাও অস্বীকার করবার নয়। পুরানো কর্ম্মী যাঁরা আছেন তাঁরা এই নূতন বিজ্ঞানটিকে এবং যাঁরা এই নূতন বিজ্ঞান শিক্ষা করে নূতন গ্রন্থাগারে আসছেন তাঁদের ভালো চোখে দেখতে পারেন না। পুরাতন যাঁরা, তাদের বই সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান, কোন বইখানি কার লেখা এবং কার লেখা কোন বই তা তাঁরা নতুনের চেয়ে ভালই জানবেন তার কারণ বইয়ের সঙ্গ তাঁরা বহুদিন ধরে পেয়ে আসছেন, কিন্তু একথাও ঠিক যে জ্ঞান পুরাতন কর্ম্মীরা বহুদিনের কর্ম্মের ফলে অর্জ্জন করেছেন—তাহা অর্জ্জন করতে নতুন কর্ম্মীদের বিন্দুমাত্রও সময় লাগে না—আর কোন্ বই কার লেখা বা কোন্ বইয়ের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে সে নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ বই যার লেখাই হ'ক আর যে নামেরই হ'ক ব্যবসায়ের যন্ত্র ঠিক থাকলে এবং সে যন্ত্র ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলে তা জানবার জন্যে মোটেই কষ্ট করবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং নতুনের উপর পুরাতনের এ বিদ্বেষ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আপন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে মাত্র।

কোন কর্ম্মীর কাজ সম্বন্ধে কোন নিন্দা বা দোষ বা'র হ'লে কর্ম্মীর উচিত হচ্ছে অনুসন্ধান করে দেখা, নিজের কাজের মধ্যে নিন্দা করবার মত কিছু আছে কি না, এবং সেরূপ কিছু পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করা প্রয়োজন—তাতে ক্ষুণ্ণ হবার বা অবমানিত মনে করবার কিছু নেই। গ্রন্থাগারে কর্ম্মীদের দেরী করে আসা কিছুতেই অনুমোদন করা যায় না। দেরী করে আসাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃত, এবং তার কারণ কতকটা মানসিক বিকার। যিনি দেরী করে আসেন তিনি ভালো ভাবেই জানেন দেরী করে আসা অন্যায়, তবু দেরী করে আসার কারণ কি? বেশীর ভাগ

ক্ষেত্রেই দেখা যায় দেরী করে আসার অজুহাত হ'চ্ছে বিশেষ কাজ, বা বাড়ীতে অসুখ কিন্তু এটুকু মনে রাখতে হবে রোগীর সেবার জন্য এবং বাড়ীর কাজ করবার জন্য জনসাধারণ মাহিনা দিতে নারাজ। দেরী করে আসাটা ক্রমশঃ স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেলে সব কাজেতেই দেরী হ'তে থাকবে। গ্রন্থাগারে কর্ম্মীদের তৎপরতাই হ'চ্ছে একটি প্রধান গুণ—এবং তৎপর কাজ হওয়ার জন্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

শেষে এইটুকু বলা দরকার যে, কতগুলি নীতিমূলক আইন সন্নিবিষ্ট করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা জীবনের পেশা হিসাবে এ পথে আসছে তাদের কাছে গ্রন্থাগারের কাজের প্রকৃতিটা প্রকাশ করা। অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারের কাজ আরামের কাজ এবং বেশী বাঁধা-ধরার মধ্যে কাজ করতে হয় না—এ ধারণা একেবারে ভুল। কাজের তুলনায় মাহিনা যেখানে অতি নগণ্য, কাজ করেও কুকথা শোনবার সুযোগ যেখানে বেশী, সেরূপ কাজ যে কত আরামের তা সকলেই ধারণা করতে পারেন। তবে বই যাঁরা ভালোবাসেন, মানব মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যাঁরা নিজেকে ঘনিষ্ঠ রাখতে চান, তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে ভালো পেশা হয়তো আর নেই। যাঁরা নিজের স্বার্থ-ত্যাগ করে জনসাধারণের কাজ করতে চান, যাঁরা জনসাধারণের মনের গতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান, এবং যাঁরা অন্ততঃ নিজেকে নিজের কাছে মূল্যবান করে তুলতে চান, তাঁরা আসুন এই পথে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুস্তক নির্ব্বাচন

এই ছোট বইয়ে আমরা পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সব কথা বলবো না। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব আমরা এ পরিচ্ছেদে শেষ করবো।

প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হ'বে যে পুস্তক নির্ব্বাচনের উপর গ্রন্থাগারের সমুদয় কাজই নির্ভর করেছে কারণ বই নিয়েই গ্রন্থাগার। পুস্তক সংগ্রহ ভালো না হ'লে পাঠক আসবে না সুতরাং গ্রন্থাগারের পুস্তক সজ্জিত হ'য়েই থাকবে কিন্তু গ্রন্থাগার নিষ্ক্রীয় থেকে যাবে।

পুস্তক নির্ব্বাচনের সমুদয় কাজটাকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটী ধাপে ভাগ করা যায়।

(ক) আঞ্চলীয় কয়েকজন ব্যক্তির কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার প্রয়োজন হয়—**চাহিদার অস্তিত্ব**।

(খ) তাদের চাহিদা মেটাবার জন্যে তারা গ্রন্থাগার গড়ে তুললে—**চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রন্থাগার**।

(গ) গ্রন্থাগারিক কোন বিষয়ের চাহিদার সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলো।

(ঘ) সে জানবার চেষ্টা করতে থাকলো চাহিদার মূল্য কতটা—**চাহিদার মূল্য**।

(ঙ) তারপর সে জানবার চেষ্টা করলো চাহিদার পরিমাণ কতটা—**চাহিদার পরিমাণ**।

(চ) চাহিদাটা কি ধরণের—সাধারণ জ্ঞানের জন্যে কি গভীর জ্ঞানের জন্য ; এ বিষয়ও তার জানা প্রয়োজন—**চাহিদার চরিত্র**।

(ছ) তারপর সে চিন্তা ক'রে দেখলে যা বই গ্রন্থাগারে আছে তার দ্বারা কতটা চাহিদা মেটাতে পারা যায়।

(জ) আরও বই যদি কিনতে হয় তা হ'লে আর কত বই কিনতে হ'বে এবং কি ধরণের বই কিনতে হবে বিচার করে দেখার পর তার পুস্তক নির্ব্বাচনের কাজ শেষ হয়ে গেল।

এই ধাপগুলির একটীর পর একটীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবার পূর্ব্বে আমরা বলে রাখি যে গ্রন্থাগার কেবল গ্রন্থের আগার নয় অর্থাৎ গ্রন্থাগারের কেবল বই জড় করে রাখাই কাজ নয়। গ্রন্থাগারে এমন বই জড় করে রাখতে হ'বে যার ব্যবহার হবে অর্থাৎ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বইখানি সক্রিয় হওয়া চাই।

(ক)

মানুষ যেই তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে অমনি তার চাহিদা দেখা দেয়। মানুষ প্রয়োজন অনুভব করে বিশেষ কোন একটী অবস্থার দরুণ। এই অবস্থাটার উপরেই নির্ভর করে মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে—এই অবস্থাটাকে এ প্রবন্ধে আমরা সব সময়ে বলবো **ইতিহাস**। সুতরাং ব্যক্তির চাহিদা নির্ভর করবে তার ইতিহাসের উপর। ঠিক ঐ একই কারণে এক যুগের যা প্রয়োজন সে প্রয়োজন আর এক যুগের মানুষের থাকে না। তবে অনেক সময় দেখা যায় একই যুগের মানুষের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে না কেউ সচেতন থাকে। সচেতন মানুষের মধ্যে একজন হ'চ্ছে লেখক। তার চেতনা উপলব্ধ প্রয়োজন সে লেখে। তার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে আর সকলকে সচেতন করে তোলা। গ্রন্থাগারের আর একটি কাজ হ'চ্ছে চাহিদার সৃষ্টি করা লেখক ও পাঠকের মাঝখানে মধ্যস্থ হ'য়ে।

(খ)

গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে পাঠকের চাহিদা মেটানো। চাহিদা থাকলেই তবে চাহিদা মেটানো যায়! চাহিদা সব সময়েই থাকে। গ্রন্থাগার না

থাকলেও চাহিদা থাকতো, সুতরাং গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব যে কেবল গ্রন্থাগারের কাজের উপর নির্ভর করছে তা নয়।

পাঠক বই পড়ে তাই তাকে বই দেওয়া হয়। সে বই পড়তে না চাইলে কেউ তাকে বই পড়াতে পারে না। সুতরাং এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি চাহিদার পরিমাণ যত, চাহিদা মেটানোর কাজের পরিমাণও তত।

(গ)

গ্রন্থাগারিক চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলো। সেজন্য গ্রন্থাগারিককে সব সময় সচেতন থাকতে হ'বে ও পাঠকদের সংস্পর্শে আসতে হবে। গ্রন্থাগারিকের তার আঞ্চলীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে ও অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

(ঘ)

এর পর গ্রন্থাগারিকের ঠিক করতে হবে চাহিদার মূল্য কতটা। এখন সমস্যা হচ্ছে চাহিদার মূল্য নির্দ্ধারণ করার ভিত্তি কি হ'বে। কা'রো চাহিদা পার্থিব সুখের জন্য কা'রো চাহিদা নৈতিক উন্নতির জন্যে, কা'রো চাহিদা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে। এই সকল কারণেই প্রয়োজন হ'তে পারে। কোন প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার জন্যে বেশী বই রাখতে হবে, কোন প্রয়োজন মেটাবার জন্য কম বই রাখতে হবে তা ঠিক করা যাবে কি করে? আসল কথা গ্রন্থাগারে প্রয়োজনকে এরূপভাবে ভাগ করে তার মূল্য ঠিক করা সম্ভব নয়। এখন যদি আমরা বলি সেই প্রয়োজনই মূল্যবান যা মানুষকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। হয়তো অনেকে বলবেন জন্মেছি যখন তখন মরতে হবে, তবে আর কেন এত গড়ে তোলাতুলি। আমরা বলবো যারা একথা বলে তারা আত্ম-সচেতন নয়—তারা জানে না মানুষের ভিতর যে শক্তি রয়েছে তা ভগবানের সমান—তা কেবল পিছনকে ফেলে সামনে ছুটে চলে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যক্তিকে গড়ে তোলে। জন্ম থেকেই ব্যক্তির সুরু হল নিজেকে গড়ে তোলা—সুতরাং নিজেকে গড়ে তোলা তার কর্ত্তব্য। সে যদি নিজেকে গড়ে তুলতে না পারে

তা হলে বুঝতে হবে সে নিজের কাছে এবং সমাজের কাছে কর্ত্তব্যচ্যুতি করেছে। স্থতরাং যে প্রয়োজনই মানুষকে গড়ে তোলে সেই প্রয়োজনকেই আমরা মূল্যবান ধরে নেব।

তা হ'লে কি নিছক আনন্দের জন্য যে সব বই সে সব বই আমরা গ্রন্থাগারে রাখবো না। আমরা বলবো নিছক আনন্দের বইও আমরা রাখবো—যদি সে আনন্দ মানুষকে অবনতির দিকে টেনে নিয়ে না যায় এবং সেই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে এমন বই রাখতে যা আনন্দের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন করবে।

(ঙ)

এবার প্রয়োজন হ'বে চাহিদার পরিমাণ কতটা তা ঠিক করা। তা ঠিক করতে না পারলে কি প্রকারের কতটা পরিমাণ বই রাখতে হবে তা আমরা ঠিক করতে পারবো না।

সমুদয় প্রয়োজনকে দুটী ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—প্রথমতঃ প্রকাশিত চাহিদা যা বুঝতে পারা যায় চাহিদার প্রার্থনা থেকে এবং গ্রন্থাগারে যা বই আছে তার কতটা ব্যবহার হচ্ছে তা দেখে।

দ্বিতীয়তঃ অপ্রকাশিত চাহিদা—অর্থাৎ যে চাহিদা সম্বন্ধে পাঠক এখনও সচেতন হয়ে ওঠেনি বা সচেতন হয়ে উঠলেও সে জানে না গ্রন্থাগার তার চাহিদা মেটাতে পারবে।

গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে চাহিদা মেটানো। সেইজন্যে প্রকাশিত চাহিদা গ্রন্থাগারের দিক থেকে বেশী প্রয়োজনীয়।

চাহিদার পরিমাণ বোঝা যায় সাধারণতঃ দুটী উপায়ে।

(১) পুস্তক নির্গমনের তালিকাঃ জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্গমনের তালিকা জনসাধারণের চাহিদার মাপ কাঠি। এই মাপকাঠি যথাযথ ভাবে তৈরী করে রাখতে পারলে, জনসাধারণের কোন কোন বিষয়ের উপর চাহিদার পরিমাণ কতটা তা অনেকটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রোজ

কি বই বার হ'চ্ছে না হ'চ্ছে তা বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়ানুযায়ী সাজিয়ে না রাখলে তা কোনই কাজে লাগে না। পুস্তক নির্গমনের তালিকা করতে হয় পুস্তকের প্রার্থনা পত্রের সাহায্যে। প্রার্থনা পত্রেই পুস্তকের জাতি সংখ্যা লেখা থাকবে সেই জাতি সংখ্যা অনুযায়ী যতটা সূক্ষ্মভাবে সম্ভব, প্রার্থনা পত্রগুলিকে সাজিয়ে রাখতে হ'বে। এক এক জাতীয় পুস্তকের নির্গমনের সংখ্যা নির্ণয় করবে সেই জাতীয় বইয়ের চাহিদা কত, এবং সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারা যাবে, সে বিষয়ের সম্পর্কিত আর কোন বিষয়ের চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা করলে তা বাড়ানো সম্ভব হ'বে। কোন বিষয়ের চাহিদা হচ্ছে না সেটাও বুঝতে পারা যাবে এবং সেইসঙ্গে ভেবে দেখতে হ'বে সে বিষয়ের চাহিদা কম হওয়ার কারণ কি।

(২) তারিখ পত্র ঃ গ্রন্থাগারিকের সময়ে সময়ে পুস্তক মঞ্চে গিয়ে বইয়ের ভিতরে রাখা তারিখ পত্র লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এক একখানি বই যে যে দিন নির্গত হয় সে সেদিনের তারিখ পুস্তকের তারিখ পত্রে ছাপা থাকে। সুতরাং তারিখ পত্র দেখালেই বুঝতে পারা যাবে ঃ—

(১) কোন বইয়ের নির্গমন বেশী

(২) কোন বইয়ের নির্গমন কম

(৩) কোন বইয়ের নির্গমন খুব বেশী

(১)

কোন একখানি বইয়ের নির্গমন বেশী হ'লে জানতে হ'বে বইখানির অন্তর্গত বিষয়ের চাহিদা আছে। বইখানির চাহিদার সঙ্গে যেন বইখানির অন্তর্গত বিষয়ের চাহিদা ভুল করা না হয়। এ-ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কাজ হ'বে সেই ধরণের আরও দু-একখানি বই কেনা কারণ একখানি বইয়ের দ্বারা সব চাহিদা মিটতে নাও পারে।

(২)

কোন বই যখন বেশী নির্গত হ'চ্ছে না তখন বুঝতে হ'বে নয় সে বইয়ের

অন্তর্গত বিষয়ের চাহিদা কম না হয় চাহিদা মেটাবার মত সে বইখানি নয়। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন অন্য একখানি বই সে স্থলে রাখলে সেই বইখানির চাহিদা হয় কি না।

(ঙ)

চাহিদা যখন খুব বেশী তখন বুঝতে হ'বে নয় বইয়ের অন্তর্গত বিষয়ের চাহিদা আছে না হয় বইখানি কোন কাজের নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে একটু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন পাঠক বইখানি অল্পমাত্র পড়েই ফিরত দিয়েছে কি না। তা বুঝতে পারা যাবে পুস্তকের তারিখ পত্রে তারিখগুলি দেখে। যদি বোঝা যায় পড়বার মত যথেষ্ট সময় না রেখেই পাঠক বইখানি ফেরৎ দিয়েছে তাহ'লে বুঝতে হ'বে বইখানি কাজের নয়। সে স্থলে অন্য বই কেনা প্রয়োজন।

(চ)

একখানি বই বা'র হ'লেই যে তা চাহিদা মেটাতে সক্ষম হ'য়েছে এ ধারণা করে নেওয়া যায় না। একই বিষয়ের চাহিদার চরিত্র নানা ধরণের হ'তে পারে। কেউ সখের জন্য বই পড়তে পারে, কেউ ব্যবসায়ের জন্য সেই বিষয়েরই বই পড়তে পারে, কেউ আবার গবেষণার জন্য বই পড়তে পারে সেই কারণে এক বিষয়ের বিভিন্ন প্রকারের বই রাখার প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে এরূপভাবে বই রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(ছ)

এতক্ষণ যা বলা হ'লো সবই চাহিদার কথা এইবার দেখা প্রয়োজন গ্রন্থাগারে চাহিদা মেটাবার মত রসদ আছে কিনা। যদি রসদ না থাকে তা হ'লে নতুন বই কিনতে হ'বে। নতুন বইয়ের কোন খানি ঠিক মত কাজের হ'বে সেটা বুঝে ওঠা গ্রন্থাগারিকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করছে। আমাদের দেশে বইয়ের সাধারণ গ্রন্থ তালিকা বলতে কিছু নেই। কি বই বার হ'চ্ছে না হ'চ্ছে তা জানতে পারা যায় প্রকাশকদের

পুস্তিকা দেখে এবং পুস্তক পরিচয় দেখে। পুস্তক পরিচয়ের উপর সব সময় নির্ভর করা যায় না কারণ আমাদের দেশের কাগজে একটু ধরাধরি করলেই ভালো ভাবে সমালোচনা বার করা যায়। সেই জন্যে সমালোচনার উপর নির্ভর করতে হ'লে দেখতে হ'বে সমালোচনা স্বাক্ষরিত কি না?

পুস্তক নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে বেশী আর কিছু বলবো না তবে এইটুকু জেনে রাখুন পুস্তক নির্ব্বাচন সুষ্টুভাবে করতে হ'লে যে অঞ্চলের গ্রন্থাগার সে অঞ্চল সম্বন্ধে এবং সেই অঞ্চলের মানুষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

একটা কাজ করতে পারলে ভালো হয়ঃ স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষা, বয়স ও ব্যবসায় অনুযায়ী আঞ্চলীয় সমুদয় লোককে কয়েকটী দলে ভাগ করে নিতে পারলে কাজ হয়। এক একটী দলের চাহিদা—জাতি, শিক্ষা, বয়স ও ব্যবসা অনুযায়ী প্রায় সমান হ'বে এটুকু আশা করা যেতে পারে এবং এক একটী দলের ব্যক্তি-সংখ্যা অনুযায়ী চাহিদা কতটা হ'বে তাও কতকটা আন্দাজ করতে পারা যাবে।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে উপন্যাস একটি সমস্যা, বিশেষ করে বাংলা দেশের গ্রন্থাগারে। অথচ উপন্যাস রাখা হবেনা একথাও বলা চলে না—কারণ পাঠক যদি উপন্যাস পড়তে চায়, তাকে আমরা উপন্যাসের স্থলে অন্য বই দিতে পারি না। একটা কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি চাহিদা কেবল আনন্দের জন্যে হ'লেও তা মেটাতে হ'বে, ত'বে চেষ্টা করতে হ'বে আনন্দের ভিতর দিয়ে যা'তে ব্যক্তিকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে নিজের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে, সেই জন্যে ব্যক্তিকে নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে যতটা সচেতন করে তুলতে পারা যায় ততই ভালো। ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া আর যে কোন উপন্যাস সমাজের মানুষকে নিয়ে। সমাজের মানুষ তাদের ইতিহাসকে ভিত্তি করে ভাঙ্গা গড়ার দোলায় কিরূপে এগিয়ে চলছে এই সব বিষয়ই লেখা থাকে উপন্যাসে। আর লেখক সব

সময়ে চেষ্টা করে তার অনুভূতি উপলব্ধ জ্ঞান পাঠকের কাছে প্রকাশ করে তাকে তার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে। সুতরাং যে সব উপন্যাসের ভিত্তির সঙ্গে সমাজের ভিত্তির মিল আছে সেই সব উপন্যাসই জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখা ভালো। কারণ সমাজ আর ব্যক্তি বিভিন্ন নয়—ব্যক্তিই সমাজের ছবি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বইয়ের যত্ন ও স্বাস্থ্য রক্ষা

বই যারা ভালোবাসে তারা বুঝতে পারে অকালে কোন বইয়ের জীবন নষ্ট হ'লে তা কতটা মনে লাগে। তার কাছে বই যেন পোষ্য পুত্র। সময়ে অসময়ে নিজের বই নিয়ে সে নাড়াচাড়া করে, যেন তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে তাদের যত্ন করে সে মনে আনন্দ পায়। জীবনে কতবার সে নিজের বইগুলির সংস্পর্শে এসেছে, কতবার সে বইগুলিকে খুলেছে—কতবার পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই—তবু যেন তার সাধ মেটে না—তবু যেন বইগুলো তাকে নিত্যনতুন আনন্দ দেয়—বইগুলোর উপর তার যেন মায়া পড়ে যায়। এ মায়ার কারণ কি! এর কারণ আর কিছুই নয় বইগুলো নির্ব্বাক হলেও বইয়ের লেখাগুলো জীবন্ত—তারা জীবন্ত মানুষের জীবন যুদ্ধে অর্জ্জন করা অভিজ্ঞতার প্রকাশ।

ছোট ছেলের ভবিষ্যৎ সুদীর্ঘ করতে হ'লে শিশুকালে তার যেমন যত্ন নিতে হয়—তাকে যেমন আলো হাওয়ার মধ্যে রাখতে হয়—তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন সুখকর করতে হয়—তার খেলাধূলার পর তাকে ঝেড়ে ঝুড়ে যেমন পরিষ্কার জামা কাপড় পরাতে হয় তেমনি ভাবে বইয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সুদীর্ঘ করতে হ'লে বইয়েরও যত্ন নিতে হয়। "প্লাশ কেশ" বেবীর যেমন ভবিষ্যৎ অন্ধকার তেমনি "প্লাশ কেশ" বইয়ের জীবনও অন্ধকার। শিশুর গোড়ার দিকের জীবন সুখের হ'লে তার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হওয়া খুবই সম্ভব তেমনি বইয়ের গোড়াকার জীবন সুখের হ'লে তার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হয়। শিশুর জন্মের মূলে বংশগত দোষ থাকতে পারে—বইয়ের জন্মের মূলেও বংশগত দোষ থাকতে পারে; বংশগত দোষের জন্য শিশুর বিশেষ যত্ন নিতে হয়। বইয়ের

বংশগত দোষের জন্যও তার বিশেষ যত্ন নিতে হয়। বইয়ের বংশগত দোষের মধ্যে হচ্ছে কাগজের গুণাগুণ, বাঁধাইয়ের দোষগুণ ইত্যাদি। বইয়ের আকার অনুযায়ী কাগজ ও বাঁধাই না হলে বইয়ের জীবন অল্প দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আধুনিক যুগে, শহরে অন্ততঃ, বই রাখবার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা মুস্কিল—কারণ শহরের আবহাওয়ার উপর আমাদের হাত নেই। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার অভাবে মানুষের জীবনই অকালে নষ্ট হয়ে পড়ছে তা বইতো দূরের কথা। বেশী ঠাণ্ডা বা বেশী গরম, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় এতো সকলেই জানে। অন্য দেশে আবহাওয়াকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনার ব্যবস্থা করেছে বটে কিন্তু আমাদের দেশে ঘরে ঘরে তা সম্ভব হওয়ার সময় আসতে অনেক দেরী।

৬০ ডিগ্রী থেকে ৭০ ডিগ্রী উত্তাপ বইয়ের স্বাস্থের পক্ষে ভালো এবং বায়ুর আদ্রতা থাকা দরকার শতকরা ৫০ থেকে ৩৫ ভাগ।

সূর্য্যের আলো জীবাণু নষ্ট করে কিন্তু সূর্য্যের আলো বেশী লাগলে আজ কালকার বইয়ের পাতা ও বাঁধাই কমজোরী হ'য়ে যায়। অন্ধকারে বইয়ের পাতা ও বাঁধাই ভালো থাকে কিন্তু অন্ধকারও বইয়ের স্বাস্থের পক্ষে হানিকর। কোন কিছুর "বেশী বাড়াবাড়ি" ভালো নয় একথা সকলেই জানেন।

গ্রন্থাগারে বইয়ের যত্ন

গ্রন্থাগারে নতুন বইখানি এলো—চকচকে তার বাঁধাই—সুন্দর হরফে ছাপা—প্রকাশকের কোনই দোষ দিতে পারবেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ সব ধারণা ভুল কারণ আজকাল "রূপটা" দেখানোই একটা ধারা হ'য়েছে অন্ততঃ ব্যবসার খাতিরে।

বই খোলা। বই খোলা আবার এমন কি কাজ? কাজটা যতটা সহজ বলে মনে হয় ততটা সহজ নয়। খোলবার সময় বইখানির যত্ন ঠিকমত না

নিলে বইখানির জীবন অনেকখানি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বইয়ের বাঁধাই যদি ভালো হয় তাহ'লে ভাববার কিছু থাকেনা—কিন্তু বাঁধাই ভালো না হ'লে বইখানি খোলবার সময় বইয়ের শেলাই কেটে যেতে পারে। গ্রাহক বই খোলবার জন্যে যত্ন নেবে কি না নেবে তার চিন্তা না করে গ্রন্থাগারের কর্মীকেই সে কাজটা করে রাখা দরকার। বই প্রথমে খোলবার দুটী উপায়।

ক। বইখানির পিঠের দিকটা টেবিলের উপর সোজা করে রাখুন। প্রথম বইয়ের সমুখের মলাট খুলুন তারপর খুলুন পিছুনের মলাট তারপর সামনের দিক থেকে কয়েকখানি পাতা পর্য্যায়ক্রমে খুলে—পাতার গোড়ার দিকে জোরে কিন্তু ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকুন।

খ। বইখানি একেবারে মাঝামাঝি খুলে ধীরে ধীরে পিছন দিকে মুড়ে ফেলুন তারপর ধীরে ধীরে কিছু কিছু পাতা দু'দিক থেকে ছাড়তে আরম্ভ করুন যতক্ষণ না কেবলমাত্র মলাট দুটী আপনার হাতে থাকছে।

এই দুই উপায়ে বই খুলে বইয়ের শেলাই কেটে যা'বার ভয় আর থাকেনা। অবশ্য বাঁধাই ভালো হ'লে বই খোলার সময় চিন্তা কিছুই থাকেনা—কিন্তু বইয়ের বাঁধাই ভালো কি মন্দ তা আবিষ্কার করবার আগেই বয়ের ক্ষতি হ'য়ে যেতে পারে।

বই দেখে নেওয়া :—বই খোলার পর দেখে নেওয়া দরকার বইখানি সম্পূর্ণ আছে কিনা। বইয়ের পাতাগুলি একখানি একখানি করে দেখা দরকার। কোন পাতা নেই বা কোন ফর্মা উল্টো বসানো হ'য়েছে কি না—কোন পাতা ছেঁড়া আছে কিনা, কোন পাতার উপর আর কোন পাতায় ছাপ পড়েছে কিনা এ সব দেখে নেওয়া প্রয়োজন। দপ্তরীর ভুলের জন্য বইয়ের মলাট উল্টো বসানো হ'য়ে থাকতে পারে—এক বইয়ের মলাট আর এক বইয়ে বসান হ'য়ে থাকতে পারে। কোন দোষ ধরা পড়লে বইখানি বদলে নেওয়া চলে কিন্তু ব্যবহারের পর দোষ ধরা পড়লে তা আর বদল করা চলে না।

বইয়ের "প্রবেশ" "অধিকার" ও তালিকা : পুস্তক প্রবেশের

খাতায় যে বইখানি তোলা হ'য়েছে তার কোন প্রমাণ বইয়ের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। বইখানি কার এবং বইখানি যে তালিকাভুক্ত হ'য়েছে তারও প্রমাণ কিছু বইয়ের ভিতরেই থাকা প্রয়োজন। এ সব বিষয়ের চিহ্ন তা যে কোন প্রকারেরই হ'ক তা বইয়ের এমন জায়গায় দিতে হ'বে যা'তে বইখানির সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়। বইয়ের মালিকের পরিচয় বইয়ে পিছনের মলাটের ভিতর দিকে থাকাই ভালো। বইয়ের শেষের পাতার নীচে পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও বইয়ের প্রথম পাতার পিছন দিকে তালিকার নম্বর দিতে হয়। এ সব চিহ্নগুলো যত বেশী কম চোখে পড়ে ততই ভালো। **ছাপ দেওয়া**। বইয়ে ছাপ না দিলে বই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী এরূপ এক ধারণা আছে সেই কারণেই ছাপ দেওয়ার রীতি। বইয়ের উপর যে ছাপ দেওয়া হ'বে তা যেন দৃষ্টি-কটু না হয়। বইয়ের প্রথম পাতার সামনে দিকে কখন ছাপ দিতে নেই, অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পাতার আগের পাতায় একখানি ছবি থাকে এবং প্রথম পাতায় ছাপ দিলে ছবিখানির উপর ছাপের ছাপ উঠতে পারে। ছাপটি ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে বই মুড়লেও ছাপের ছাপ পড়বার সম্ভাবনা থাকে। ছাপ দেবার সময় তা বেঁকে না যায়, ধেবড়ে না যায় এ সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

পুস্তকের মঞ্চ-জীবন। আজকালকার পুস্তকাগারে বইয়ের মঞ্চ খালি রাখা অন্যায়, আবার অচল বইয়ে তা ভরে রাখাও অন্যায়। কিন্তু মঞ্চ ভরে রাখতে হ'বে অথচ এমন সময় আসবে যখন গ্রন্থাগারের মঞ্চে আর নূতন বইয়ের স্থান হ'বে না। কারণ গ্রন্থাগার যত ক্ষুদ্র অবস্থাতেই আরম্ভ হোক না কেন তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে।

মঞ্চের উপর বইগুলি যা'তে হেলে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হ'বে সে জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বইয়ের ঠেকনা ব্যবহার করা প্রয়োজন। বই হেলে পড়লে, বড় বই বেঁকে যায় এবং বইয়ের বাঁধাইয়ের ক্ষতি হ'তে

পারে। বইয়ের ঠেকনার দাম বেশী নয় এবং বেশী পরিমাণে কিন্‌তে পারলে আট আনা থেকে বার আনার মধ্যে একটী ঠেকূনা পাওয়া যেতে পারে।

বই বেশী ঠেসে রাখায়ও বিপদ আছে। গ্রন্থাগারে যখন বই দেওয়া নেওয়ার কাজ খুব বেশী হয় তখন তাড়াতাড়ি মঞ্চ থেকে বই বার করার সময় বইয়ে পিছনের বাঁধাই ছিঁড়ে যেতে পারে। বই মঞ্চ থেকে বার করবার সময় কখনও বইয়ের পিছনের কাপড়, চামড়া বা কাগজ ধরে টানতে নেই। বই কেমন করে মঞ্চ থেকে বার করতে হয় তার নমুনা দেওয়া হ'য়েছে। এই নমুনা অনুযায়ী ছবি মঞ্চের স্থানে স্থানে ঝুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। তারপর বড় বইয়ের পাশে খুব ছোট বা পাতলা বই রাখতে নেই। ভারী বইয়ের চাপে ছোট বইগুলি সম্পূর্ণ ভাবে জখম হ'য়ে যেতে পারে। ছোট এবং পাতলা বইগুলিকে আলাদা রাখতে পারলেই ভালো হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে সে বইগুলি যেন দল ছাড়া হ'য়ে না যায়। কোন এক জাতীয় বইয়ের শেষের দিকে একটী মোটা কাগজের বাক্সের ভিতর বইগুলিকে রাখলে দুদিকই বজায় থাকে, বইয়ের স্বাস্থ্যহানিও হয় না বা বইগুলি দল ছাড়াও হয় না।

বই বেশী ঠেসে রাখলে আর এক প্রকারে বইয়ের ক্ষতি হ'তে পারে। তাড়াতাড়ি করে বই টেনে বার করবার সময় একখানি বইয়ের সঙ্গে অনেকগুলি বই বার হ'য়ে আসতে পারে এবং মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে শরীরে আঘাত পেতে পারে, তাতে সামান্য বা খুব বেশী ক্ষতি হ'তে পারে।

বইয়ের শত্রু

বইয়ের কতগুলি শত্রু চোখে দেখা যায় তাদের সামলানো বিশেষ কষ্টকর নয় কিন্তু অদৃশ্য শত্রু বিপদজনক বেশী।

হাওয়া। হাওয়া বইয়ের ভীষণ শত্রু হিসাবে কাজ করতে পারে। মানুষের শরীরের পক্ষে হাওয়া স্বাস্থ্যকর বটে কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে সকলের পক্ষে খুব বেশী শুষ্ক হাওয়া বা খুব বেশী ভিজা হাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। খুব বেশী শুষ্ক হাওয়ায় বইয়ের পাতা ও বইয়ের বাঁধাই কমজুরী হয়ে যায়। পাতাগুলো শীঘ্র ভেঙ্গে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত গুঁড়িয়ে পড়তে থাকে। সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ হয় তা বলা চলে না। শুষ্কতায় বই খারাপ হওয়া নির্ভর করে বইয়ের কাগজের গুণাগুণের উপর। কিন্তু আজকালকার দিনে প্রকাশকদের লক্ষ্য হচ্ছে বই বেশী বিক্রি করা, সে কারণে বই যতটা সস্তা করতে পারা যায় তার চেষ্টা হ'য়ে থাকে কাজেই ভালো কাগজে বই ছাপানো সম্ভব হয় না। তার উপর বই বাঁধাইয়ের জন্য চামড়া বা কাপড় তৈরী হয় না। সাধারণ বাজারে চামড়া ও কাপড় কিন্‌তে হয় বই বাঁধাবার জন্যে সে কারণে বাঁধাইয়ের জন্য চামড়া বা কাপড় ঠিক উপযোগী না হ'তেও পারে।

ভিজা ঠাণ্ডা। বেশী স্যাঁত-স্যাঁতে অবস্থায় বই রাখলে বইয়ের উপর ছাতা পড়ে আর বইয়ের আঠা নরম হ'য়ে যাওয়ার দরুন বইয়ের বাঁধাই খুলে যায়। নতুন বইয়ের বাঁধাইয়ের উপর ছাতা ফুটলে বইয়ের বাইরের রূপ কী কুশ্রী হ'য়ে যায় তা সকলেরই জানা আছে। বিশেষ করে বিলাতি বই—যা শুষ্ক আবহাওয়ার উপযোগী করে' তৈরী আমাদের দেশের ভিজে আবহাওয়ায় পড়ে অতি অল্প দিনেই নষ্ট হ'য়ে যায়। নীচের ঘরে বই রাখলে তা অন্তত দেড় ফুট উঁচুতে রাখা প্রয়োজন এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার বইয়ের মঞ্চ ঘরের দেওয়াল থেকে যেন অনেকটা দূরে থাকে। ঘরের আবহাওয়াকে শুষ্ক রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে ঘরের উত্তাপ বাড়ানো প্রয়োজন। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বইয়ের বাঁধাই পরিষ্কার করা প্রয়োজন এবং এ সব ক্ষেত্রে বই যত বেশী নাড়া চাড়া হয় ততই ভালো। ঠিক বর্ষার পর এবং শীতের আগে যেমন গরম জামা কাপড়

রোদে দেওয়া রীতি আছে তেমনি বইও রোদে দিয়ে ঝেড়ে মুছে আবার যথাস্থানে রাখা প্রয়োজন কিন্তু মনে রাখতে হ'বে বেশী রোদ লাগলে বইয়ের স্বাস্থ্যহানি হয়।

দূষিত হাওয়া। দূষিত হাওয়া থেকে সাবধান হওয়া বড় মুস্কিল কারণ দূষিত হাওয়ায় যে বইয়ের ক্ষতি হ'চ্ছে তা বোঝবার আগেই ক্ষতি এত বেশী হ'য়ে যায় তা আর সম্পূরণ করা যায় না। দূষিত হাওয়ায় ক্ষতি হয় বেশী সহরে—যেখানে আধুনিক যন্ত্র যুগের দানবীয় লীলা দিন রাত চলছে সহর থেকে দূরের অবস্থা তত সঙ্গীন নয়। সহরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার, নালা নর্দ্দামা পরিষ্কার এ সবের ব্যবস্থা যথেষ্ট-ই হয়েছে কিন্তু দূষিত হাওয়াকে সংশোধন করবার কোন পন্থাই অবলম্বন করা হয় নি—সেজন্যে সহরবাসীকে যেমন তার আপন পুত্র কন্যার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হয় তেমনি তার পোষ্য-পুত্র বই গুলির স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

হাওয়ায় জীবাণু। রোগীর পড়া বইয়ের উপর সাধারণতঃ সকলেই একটু সন্দিগ্ধ। হাওয়ায় উড়ে আসা জীবাণুও বই দূষিত করতে পারে। আজকাল বহু উপায় হ'য়েছে বই সংশোধিত করে নেবার কিন্তু ডাক্তাররা বলেন জীবাণুর দ্বারা বই দূষিত হ'লেও তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কোন রোগীর দ্বারা অধিকভাবে বই দূষিত হ'লে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে যদি বই থেকে রোগের জীবাণু আর কারো শরীরে প্রবেশ করে তবেই তা ক্ষতিকর হয়। যক্ষার জীবাণুর সম্বন্ধেও ডাক্তারদের ঐ একই মত।

ছারপোকা ও আরশুলা:—এদের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে সোজা উপায় হ'চ্ছে বই রোদে দেওয়া। তবে বইখানিকে বন্ধ ঘরে রেখে প্যারা-ডাইক্লোরোবেন্‌জিন্ গ্যাস দিলে এদের ডিমগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট হ'য়ে যায়।

বইয়ের পোকা নানারকমের তন্মধ্যে হ'চ্ছে "রূপালী মাছ, আর বি ধিপোকা'। ইঁদুরও বই নষ্ট করে, এরা আসে বইয়ের আঠা খাবার জন্যে।

আমাদের দেশে বইয়ের পোকার হাত থেকে বইকে বাঁচাবার জন্যে অনেকে বইয়ের ভিতর "কালোজীরে" ও "নিমপাতা" রেখে দেয়। "কালোজীরের কতটা কাজ হয় বলতে পারি না। কিন্তু নিমপাতায় সে বইকে পোকার হাত থেকে বাঁচানো যায় তার প্রমাণ অনেক পেয়েছি। পুরানো পোকা ধরা বই নিয়ে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে এক একখানা বই বেরিয়েছে যা'তে পোকা একেবারে ধরেনি এবং বই খুলে দেখেছি বইয়ের ভিতর মাঝে মাঝে নিমের পাতা এক একখানি রাখা আছে।

যে ঘরে বেশ আলো বাতাস খেলে এমন ঘরে বইয়ে পোকা ধরতে বড় একটা দেখা যায় না। বইয়ে পোকা ধরলে—যে পোকাগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিকে মেরে ফেলা দরকার তারপর বইখানিতে D. D. T. বা Carbon Tetrachloride-এর ছিটা দেওয়া উচিত।

বই খানিকে উঁচু করে বসিয়ে কোন পিচকারীর সাহায্যে এই দু'টী ঔষধের কোন একটী বেশ ভালো করে ছিটিয়ে দিতে হয়।

বইয়ে ধোঁয়া দেবার জন্যে Formaldehyde বা ঐরূপ আর কোন বস্তু ব্যবহার না করাই ভালো। এই ঔষধ গুলি ব্যবহার করবার যন্ত্র গুলির উপর সম্পূর্ণ অধিকার না থাকলে বই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

ছাতা ধরা—স্যাঁত-স্যাঁতে জায়গায় ও ভিজা আবহাওয়ায় ছাতার জন্ম হয়। সুতরাং শুষ্ক ও আলো হাওয়া খেলে এমন ঘরে বই রাখতে পারলে বইয়ে ছাতা ধরার ভয় থাকে না।

শুষ্ক ও আলো হাওয়া খেলে এমন ঘরে রাখলে ছাতার হাত থেকে বাঁচা যায় একথা বলা খুব সোজা কিন্তু কাজে করা দুরূহ কারণ আমরা আগেই বলেছি বই রাখবার মত করে ঘর তৈরী করা আমাদের খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটে ওঠে। তবে একটা কাজ করা সম্ভব হ'তে পারে ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে দু' একটী Heater ব্যবহার করতে পারলে মাঝে মাঝে ঘর খানিকে শুষ্ক করতে পারা যায়।

মলাটের উপর ছাতা ধরলে তা এলকোহল দিয়ে মুছে নিলে চলে কিন্তু বইয়ের ভিতর, পাতার গোড়ায় এবং বাঁধাইয়ের শেলাইয়ে ছাতা ধরলে বইকে সামলানো সম্ভব হয় না।

ধুলা ঝাড়া—বইয়ের ধূলা ঝাড়বার সময় বইয়ের ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হয়। বই ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখা দরকার—একথা সকলেই জানে। বইয়ের উপর ধূলা পড়লে ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় না কিন্তু বইকে ঠুকে ঠুকে ধূলা ঝাড়লে বইয়ের অশেষ ক্ষতি হয়। বইয়ের ধূলা যদি পরিষ্কার করতেই হয় তা ঝেড়ে পরিষ্কার করা দরকার। ধূলা কখনও মুছে পরিষ্কার করতে নেই. তা'তে বইয়ের পাতার ভিতর ধূলা ঢুকে যায় এবং তা পরিষ্কার করা আর সম্ভব নয়।

ধূলা শোষন যন্ত্র পাওয়া যায়, কিন্তু দেখা গেছে সে যন্ত্রের দ্বারা মনোমত কাজ পাওয়া যায় না।

বইয়ের উপর নজর রাখা—রোগ ধরবার পূর্ব্বেই যা'তে রোগ না ধরে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই জন্যে রোগের সকল প্রকার প্রতিষেধক ব্যবহার করা উচিৎ। বইয়ের বাঁধাইয়ে ছাতা ধরছে কি না, বইয়ে পোকা ধরেছে কি না এ সব লক্ষ্য না রাখলে বইকে এসব শত্রুর হাত থেকে বাঁচানো দুরূহ হ'য়ে পড়ে। মাঝে মাঝে পুস্তক মঞ্চে রাখা বইগুলিকে একখানি একখানি করে পরীক্ষা করা দরকার। রুগ্ন বইখানিকে সুস্থ বইয়ের দল থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার হয় রোগের সংক্রামণের হাত থেকে সামলাবার জন্যে। যে সব বই একটু আধটু ছিঁড়ে গেছে সে সব বই সঙ্গে সঙ্গে সারিয়ে ফেলা দরকার। সামান্য ক্ষতি হ'লে তা বড় কেউ লক্ষ্য করে না কিন্তু অল্প মাত্র ক্ষতি যে শেষ পর্য্যন্ত জীবন নাশের কারণ হ'তে পারে তা সকলেরই জেনে রাখা উচিত।

বই সারানো

বই সারাতে গেলে জানা প্রয়োজন বই কি করে তৈরি হয়। বই

বাঁধাইয়ের জিনিষপত্র, চামড়া, কাপড়, কাগজ, সূতা, আঠা, এ সব সম্বন্ধে যা'র জ্ঞান যত বেশী সে তত বেশী সুফল পায় বই সারানোর কাজে। কেমন করে আঠা লাগাতে হয়, কাগজ ক্ষণ-ভঙ্গুর কি শক্ত—আঠায় কাগজের কি ভাবে ক্ষতি হ'তে পারে এ সব বিষয়গুলি ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

যার তার দ্বারা বই সারানোর ফলে বইয়ের অকাল বার্দ্ধক্য এসে যায়। সময়ে ভালো লোকের দ্বারা বই সারিয়ে নিতে পারলে বইয়ের আয়ু অনেক বৃদ্ধি পায়।

বইয়ের শরীর তত্ত্ব শেখা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়।

বইয়ের শরীর তত্ত্ব: জীয়ন্ত মানুষের উপর ছুরি চালাতে হ'লে আগে মরা মানুষের উপর যেমন ছুরি চালাতে শিখতে হয় তেমনি জীয়ন্ত বইয়ের উপর ছুরি চালাতে হ'লে আগে মরা বইয়ের উপর ছুরি চালানো দরকার।

অকেজো হ'য়ে গেছে এমন একখানা পুরানো বই নিয়ে তা কাটতে সুরু করুন এবং দেখুন বইখানি কিরূপে তৈরি হয়েছে তা কতটা শিখতে পারেন।

বই বাঁধানো সম্বন্ধে আমরা কোন কথা এখানে বলবো না সুতরাং এখানে সে বিষয় না তোলাই উচিত।

বই সারানোর কাজ করতে গেলে আঠার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী সেই জন্যে আঠার ভালো মন্দ জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন।

আঠা। আঠা দুরকমের। একপ্রকার আঠা তৈরী হয় জান্তব পদার্থ থেকে যেমন শিং, চামড়া, হাড় ইত্যাদি গলিয়ে। এই প্রকারে আঠা শুকিয়ে গেলেও নমনীয় রাখা যায়। অন্য প্রকারের আঠা শুকিয়ে গেলে ভঙ্গুর হ'য়ে যায় এবং সে সব আঠা সাধারণতঃ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ—যেমন ময়দা, এরারুট, তেঁতুলবিচীর গুঁড়া এই সব বস্তু থেকে তৈরী হয়।

জান্তব পদার্থ থেকে তৈরী আঠার সহিত গ্লিসারীন মেশালে তা নমনীয় থাকে। এই প্রকারের আঠায় আদ্রতা কম থাকে এবং তা লাগাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায় সে কারণে বইয়ের পিছনে এইরূপ আঠা ব্যবহার করা দরকার। বই অনবরত খোলা মোড়া হয় সে জন্যে নমনীয় আঠা বিশেষ কার্যাকরী হ'বে। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ থেকে তৈরী আঠা বইয়ের পিছনে ও জোড়ের মুখে লাগালে বই খোলবার সময় তাতে ফাট ধরে এবং জোড় কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

জান্তব পদার্থ থেকে তৈরি করা শক্ত আঠা প্রথম জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর আগুনে গলাতে হয়। কিন্তু সোজাসুজি আগুনের উপর এ-প্রকারের আঠা একটুতে ধরে যাওয়া সম্ভব তা'তে আঠার জোরও কমে যায় এবং আঠা নষ্টও হয় অনেক। একটা পাত্রের উপর জল দিয়ে সেই পাত্রটী আগুনে চাপিয়ে সেই পাত্রের ভিতর আর একটী পাত্রে আঠা গলালে আঠা ধরে যাবার আর ভয় থাকে না।

শ্বেতসার জাতীয় আঠা। আঠা তৈরী করা সম্বন্ধে নিশ্চয় বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই কারণ "কাই" কখন না কখন সকলেই করেছেন। বই জোড়ার কাজে এরূপ আঠার বিশেষ প্রয়োজন কারণ এরূপ আঠার আদ্রতা থাকে বেশী এবং লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায় না।

শ্বেতসার জাতীয় আঠা করবার কয়েকটী প্রণালী :—

১। ময়দা বা এরারুট—৪০ গ্রেণ
স্যালিসিলিক এসিড—৫ গ্রেণ
জল —৫০০ গ্রেণ

ময়দা বা এরারুটের সঙ্গে স্যালিসিলিক এসিড বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে ফুটন্ত জল ঢালতে থাকুন এবং ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। তারপর আঠা শীতল হ'লে তা কাঁচের পাত্রে ভরে রাখুন।

এটা হ'লো খুব সাধারণ আঠা।

২। ভেক্সট্রিন —১০০০ গ্রেণ
গ্লিসারিন —৩৫ „
স্যালিসিলিক এসিড —১ „
জল —৪৫০ „

শীতল জলে স্যালিসিলিক এসিড গুলে নিয়ে তাতে ভেক্সট্রিন মেশান। তারপর দশ মিনিট কাল ৩১ ডিগ্রী বাষ্পে ফোটান। মিশ্রিত বস্তুটী ক্রমশঃ কাঁচের মত পরিষ্কার হ'য়ে যা'বে। শীতল হ'য়ে যা'বার পর গ্লিসারিণের অংশ মেশান। খুব সাবধান গ্লিসারিণের অংশ মেশান যেন বেশী না হ'য়ে যায় তা হ'লে আঠা শুকাতে চাইবে না।

বইয়ে লেবেল মারবার আটা ঃ—

আরবীয় গঁদ —১২৫ গ্রেণ
আরা গাঁৎ গঁদ — ২৫ „
গ্লিসারিণ – ১০০ „
থাইমল — ২ „

গঁদকে চুণের জলে ভিজিয়ে নিলে গঁদের এসিডের অংশ নষ্ট হয়ে যায়।

দুই রকম আঠার কখন কোনটি ব্যবহার করতে হয়। এই দুই প্রকার আঠার গুণাগুণ আমরা আগেই বলেছি ঃ একটী নমনীয় ও শীঘ্র শুকিয়ে যায়, আর একটী শুকাতে দেরী হয় এবং শুকালে শীঘ্র ভঙ্গুর হ'য়ে যায়। কাপড়, পাতলা কাগজ, গোড়ার ও শেষের পাতা জোড়বার জন্যে কাই জাতীয় আঠা ভালো। শক্ত কাপড়—এবং বইয়ে পিছন দিকের বাঁধাইয়ের অংশ জোড়বার জন্যে জান্তব পদার্থে প্রস্তুত আঠা ভালো। বইয়ের কম অংশ কাপড় বা চামড়া দিয়ে বাঁধাই হ'লে তা জান্তব পদার্থে তৈরি আঠা দিয়ে জোড়া ভালো—কিন্তু যেখানে জোড়ার কাজ বেশী অর্থাৎ বইখানি পুরাপুরি যদি কাপড়ে বা চামড়ায় বাঁধতে হ'য়ে কাই জাতীয় আঠা ব্যবহার করা ভালো।

আঠা সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমাদের দেশে আঠায়, শুকিয়ে যাবার পর আর্দ্রতা যতটা কম থাকে ততই ভালো।

বই সারার কাজে আঠার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না সে জন্যে আঠা নিজে তৈরী করে ব্যবহার করার চেয়ে দোকান থেকে কিনে নেওয়া ভালো তবে নিজেরও প্রয়োজন মত "আঠা" তৈরী করে নিতে জানা প্রয়োজন—তা'তে লাভও আছে অনেক। প্রথমতঃ খরচ কম হয়। দ্বিতীয়তঃ ঠিক যেরূপ আঠা জোড়ার কাজে প্রয়োজন ঠিক সেইরূপ আঠা তৈরী করে নেওয়া সম্ভব হয়।

আঠা লাগাবার সময় মনে রাখতে হ'বে যত কম আঠা ব্যবহার হয় ততই জোড়ার কাজ ভালো হবে। যে বস্তুর উপর কাগজ বা কাপড় না হয় চামড়া জোড়া হ'বে তার উপরে, না হয় যে বস্তুটি জোড়া হ'বে তার উপরে পাতলা করে আঠা লাগিয়ে, একটীর উপর আর একটীকে বসিয়ে জোরে চাপ দিতে হয় যাতে দুটী বস্তুরই অঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঠার অংশ প্রবেশ করে। এরূপ ভাবে জুড়লে জোড় আর খুলবে না। কিন্তু আঠা বেশী ব্যবহার করলে যে দুটী বস্তু জোড়া হ'লো সে দুটীর মাঝখানে আঠারই কতকটা অংশ লেগে থাকবে এবং আঠা শুকিয়ে গেলে জোড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে। শুধু তাই নয় বেশী আঠা দিয়ে কোন পাতলা জিনিষ জুড়ে তার উপর চাপ দিলে কাপড়, চামড়া বা কাগজের উপর কোঁচ পড়তে পারে—কাগজ ছিঁড়ে যাওয়াও সম্ভব। জোড়ার কাজেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এটুকু মনে রাখা দরকার।

ছেঁড়া পাতা। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে ফেলা প্রয়োজন। দেরী করলে পাতার ছেঁড়া অংশ আরও বেশী ছিঁড়ে যেতে পারে শেষ পর্য্যন্ত ছেঁড়া অংশটি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তা হারিয়ে যেতে পারে এবং বইখানি শেষ পর্য্যন্ত অকেজো হ'য়ে যাওয়া সম্ভব। বইয়ের পাতা যদি ছাপা অংশ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে না থাকে তা হ'লে আধ ইঞ্চি চওড়া ও ছেঁড়া অংশের চেয়ে অল্প বড় করে এক টুকরা পাতলা কাগজ কেটে, ছেঁড়া অংশের

দুটী দিক সমান করে নিয়ে, তার উপরে আঠা দিয়ে বসিয়ে দিন। টুকরা কাগজের যে অংশ পাতার ধারের দিকে বেরিয়ে রইলো সে অংশটুকু কাঁচি করে পাতার ধারের সঙ্গে সমান করে কেটে ফেলুন। কাগজের টুকরার উপর আঠা না লাগিয়ে একটী কাঁচের প্লেটের উপর আঠা লাগিয়ে সেই প্লেটের উপর কাগজের টুকরাটী বসিয়ে দিন তার পর সেটী তুলে নিলে আঠা বেশ সমান ভাবে লাগবে।

ছেঁড়া অংশটী যখন বইয়ের ছাপা অংশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত তখন একটু আটা ছেঁড়ার ধারে ধারে লাগিয়ে ছেঁড়া অংশের দুই ধার গায়ে গায়ে লাগান তারপর এক টুকরা নরম কাগজে করে ছেঁড়া অংশের উপর বেশী চাপ না দিয়ে ঘসতে থাকুন যাতে ছেঁড়ার দুদিকের উপরে পাতলা কাগজটী জুড়ে যায়। তারপর ছেঁড়া অংশটীতে চাপ দিয়ে রাখুন যতক্ষণ না অংশটী সম্পূর্ণ ভাবে শুকিয়ে যায়।

খোলা পাতা। পাতা খুলে গেলে অনেক উপায়ে তা জোড়া যায়, একটী সহজ উপায় হ'চ্ছে :—

বইখানির পাশাপাশি পাতা-খানিকে একটী টেবিলের উপর রাখুন। পাতার যে ধার বইয়ে জোড়া হ'বে সেই ধারে ১৮″ বাদ রেখে সমস্ত পাতাটী একটী বাজে কাগজের দ্বারা চাপা দিন। চাপা দেওয়া কাগজটী ভালো করে চেপে ধরে পাতার ১৮″ অংশের উপর আঠা লাগান। ঢাকা দেওয়া কাগজটী তুলে নিয়ে এবার পাতাখানি বইয়ের ভিতর লাগিয়ে দিন। ছেঁড়া-পাতাখানি পাশের পাতার গায়ে জুড়ে যাবে।

পাতার ছেঁড়া কোণ। বইয়ের কোণ পাতার কোণ ছিঁড়ে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে ফেলা দরকার। যে পাতার কোণ ছিঁড়েছে সেই পাতার কাগজের মত একখানি কাগজ জোগাড় করুন। কাগজখানি কোণ ছেঁড়া পাতার নিচে রাখুন। তারপর একটা পেনসিলের দ্বারা ছেড়া অংশের বরাবর একটী দাগ টেনে নিন। পেনসিলের দাগের ১৮″ দূর থেকে দুইটী

সরল রেখা যুক্ত কোণ বজায় রেখে কোণটী ছিঁড়ে নিন—এমন ভাবে ছিঁড়ুন যাতে ভিতর দিকের ধার একটু ঢেউখেলানো গোছের হয়। তার পর ঢেউখেলান দিকটী কোনে জুড়ে দিয়ে জোড়ের উপরে ও নীচে দুটুকরা মম-কাগজ রেখে বই খানি মুড়ে ফেলে চাপ দিন।

বইয়ের পাতায় ছিদ্র। বইয়ের কোন পাতায় ছিদ্র হ'লে তা আর বাড়তে না দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। ছিদ্রের নীচে একটুকরা শক্ত অথচ পাতলা কাগজ (Bond paper) রেখে ছিদ্রের মাপে পেনসিলের দাগ দিয়ে নিয়ে অংশটি কেটে নিন। ছিদ্রের চারি ধার দাঁত দাঁত করে কেটে নিয়ে টুকরো কাগজটী ছিদ্রের উপর বসিয়ে, উপরে একটু মোম কাগজ রেখে বইখানি মুড়ে ফেলে চাপ দিন।

সবচে ভালো হ'বে যদি একই বইয়ের আর একখানা অসম্পূর্ন বা বাতিল কপি পাওয়া যায়। ছিদ্র হ'য়ে যাওয়া পাতা-খানি খুলে ফেলে অন্য বইয়ের সেই পাতা খানি জুড়ে দিলেই কাজ মিটে গেল।

আল্‌গা মলাট—যে কোন কারণেই হ'ক মলাট আল্‌গা হ'লে তা সারিয়ে ফেলা দরকার।

বইখানি সাবধানে খুলুন—বইয়ের শিরদাঁড়ার উপর চাপ দিয়ে পিছনের আবরণটী ফাঁক করে দেখুন যথেষ্ট জায়গা আছে কি না। যদি ফাঁক যথেষ্ট হয় তা হ'লে একটা সরু বুরুশে করে ভিতরে আঠা লাগিয়ে বইখানি বন্ধ করে বইয়ের শিরদাঁড়ার উপর চেপে ঘষতে থাকুন।

বইয়ের কব্জা ও জোড়। বইখানি অনবরত খোলা মোড়ার ফলে বইয়ের কব্জা বা জোড় আলগা হ'য়ে যেতে পারে না হয় ছিঁড়ে যেতে পারে। আগেকার দিনে বইয়ের ফরমাগুলিকে মোটা দড়ির উপর দিয়ে বা ফিতের উপর দিয়ে শেলাই করে, দড়ির বা ফিতার শেষ ভাগ মলাটের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হ'তো। অল্পদিন হ'লো বই বাঁধাইয়ের ধারা পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, এখন কেবল ব্যবসার খাতিরে বইয়ের "অঙ্গ" পাতলা কাপড়ের দ্বারা মলাটের

সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। পাতলা কাপড়ের টুকরা প্রথম বইয়ের শিরদাঁড়ায় জুড়ে দুধারের বাকি অংশ মলাটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এই কাপড়ের টুকরা সাধারণত কমজুরী এবং এর উপর শীঘ্র শুকিয়ে যায় এমন আঠা ব্যবহার করলে তার পরমায়ু একেবারে কমে যায়।

নতুন করে মলাট লাগানো। এই জালতি কাপড়টি ছিড়ে গেলে নতুন করে মলাট লাগাবার প্রয়োজন হয়।

নূতন করে মলাট লাগাবার আগে, আঠা, কাপড়, কাগজ বেশ করে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। তারপর বইখানি যতটা লম্বা ততটা লম্বা এক টুকরা জালতি কাপড় নিন। কাপড়ের টুকরাটী বইয়ের অপেক্ষা দু-ইঞ্চি বেশী চওড়া হওয়া চাই। কাপড়টীর উপর নমনীয় আঠা মাখিয়ে বইখানির শিরদাঁড়া কাপড়ের ঠিক মাঝখানে জুড়ে দিন। কাপড়খানি বইয়ের দুধারে এক ইঞ্চি করে বেরিয়ে থাকবে। এইবার বইখানি মলাটের ভিতর রাখুন। বইয়ের মলাটের কাগজখানি মলাটের সঙ্গে জুড়ে দিন। তারপর পিছুনের মলাটখানি খুলুন এবং শেষের কাগজখানি এবার জুড়ে দিয়ে, দুদিকে মলাটের ভিতরে মোম-কাগজ রেখে বইখানিকে চাকা দিয়ে রাখুন যতক্ষণ না সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়।

বইয়ের মলাটের কাপড়কে বাঁচিয়ে রাখা: বইয়ের মলাটের কাপড় ময়লা হ'য়ে গেলে বা তা'র রং খারাপ হ'য়ে গেলে তা'র উপর ঠিকমত রং লাগাতে পারলে তা আবার নতুনের মত দেখাবে। বড় চামচের এক চামচ ডিমের সাদা অংশ এক কাপ জলে গুলে ফেলুন তা'তে আর এক চামচ আঠা মেশান। এই মিশ্রণ অন্ততঃ বার ঘণ্টা রেখে দিন যা'তে জলের সঙ্গে ডিমের সাদা অংশ ও আঠা ভালোভাবে মিশে যায়। তারপর প্রয়োজনীয় রং মিশিয়ে তরল পদার্থটী খুব পাতলা করে ব্রাসের দ্বারা মলাটের উপর লাগিয়ে দিন। ভালোভাবে শুকিয়ে যাবার পর মলাটের উপর এক পোঁচ বার্ণিস বা শেলাক্ লাগিয়ে দিন।

জলে ভেজা বই : জল না হ'লে কাগজ তৈরী হয় না একথা সত্যি কিন্তু কাগজের জলের মত শত্রু আর নেই একথাও বেশী সত্যি। বইয়ের মলাট বেঁকে গেলে, মলাটের রং খারাপ হ'য়ে গেলে, মলাটের উপর নানা প্রকার দাগ পড়লে, পাতা কুঁচকে গেলে বুঝতে হবে বইয়ের উপর আদ্রর্তার আক্রমণ হ'য়েছে। বেশী জল লাগার দরুন বইয়ের পাতা পরস্পরের গায়ে জুড়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত বইয়ের একখানি পাতাও আর খোলা যায় না। এইরূপ বইয়ের পাতাগুলি খোলবার সময় বইয়ের ছাপা অংশগুলি পর্য্যন্ত উঠে যায় এবং বইখানি সম্পূর্ণভাবে অকেজো হ'য়ে যায়। ভালো কাগজে তেরী বইয়ে জল লাগলে ততটা ক্ষতি হয় না। একটু স্পঞ্জ করে পাতাগুলিকে ভিজিয়ে নিয়ে সোজা করে নেওয়ার পর ব্লটিং পেপারে করে জল শুষে নিয়ে বইখানিকে প্রেসে রাখলেই কাজ মিটে যায়।

বইখানি সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেলে বইয়ের বাঁধাই খুলে ফেলে পাতাগুলিকে সোজা করে নিয়ে নতুন করে বাঁধিয়ে ফেলা ভালো।

বইয়ের শিরদাঁড়ার চামড়া বাচিয়ে রাখা। বইয়ের মালিকেরা অনেক সময় বইয়ের আসল চামড়া যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

এরূপ ক্ষেত্রে পুরাতন চামড়া অতি সাবধানে তুলে ফেলে বইয়ের শির দাঁড়ার আঠা ও কাপড় যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। আসল চামড়ার রঙের সঙ্গে যতদূর সম্ভব রং মিলিয়ে, আসল চামড়াটী অপেক্ষা ২″ বেশী চওড়া ও ১″ বেশী লম্বা একটুকরা চামড়া নিয়ে তাতে নমনীয় আঠা লাগান। বইয়ের মলাটের যে অংশ থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে সে অংশের উপরও আঠা লাগান। নতুন চামড়া এবার বইয়ের শির দাঁড়ায় লাগিয়ে দিন। বইয়ের মলাটের উপর চামড়ার যে অংশ রয়ে গেছে, সেই চামড়ার ভিতর এবার নতুন চামড়া দুই ধার প্রবেশ করিয়ে দিন। নতুন চামড়ার উপরও নিচের বাড়তি অংশ এবার ভিতরের দিকে মলাটের ভিতরের কাগজের

নীচে প্রবেশ করিয়ে ভাঁজ করে মুড়ে দিন। বইখানি ভালো করে শুকিয়ে যাবার পর শীর দাঁড়ায় পিছনের পুরানো অংশটী নতুন চামড়ার উপর জুড়ে দিন।

বইয়ের যত্ন ও বই সারা সম্বন্ধে এই সামান্য কয়টী বিষয় জেনে রাখলেই হ'লো। পুরাতন পুঁথি সারা, নানা রকম কাগজ সারা, ইত্যাদি অনেক কিছুই জানবার বিষয় আছে কিন্তু আমরা সে সব বিষয় এখানে কিছুই বল্‌লাম না কারণ সে সব ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে ঃ—

1. Brown, J. D.—
   Library Economy.
2. Harrod, L. M.—
   Lending Library Methods.
3. Headicar, B. M.—
   A Manual of Library Organisation.
4. Lydenberg, H. M. & Archer, John—
   The Care and Repair of Books.
5. McColvin, L. R.—
   Book Selection for Public Libraries.
6. McColvin, L. R.—
   Library Extension Work & Publicity.
7. Sartre, J P.—
   What is Literature ?
8. Sayers, B.—
   The Card Catalogue
9. Wellard, J. H.—
   Book Selection.